ঘণ্টা পূর্ব্বেই থানেশ্বর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গাইডকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলাম।

একটু অপেক্ষা করিতে করিতে দিল্লী হইতে মেইল ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। এবার যাত্রীর ভিড় দেখিয়া আমি মেয়েদের গাড়ীতে উঠিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, তিন চারিটি ইরাণী স্ত্রীলোক বুরকা নামক আচ্ছাদনে আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের বড় ইচ্ছা নহে যে আমি সেখানকার আসন অধিকার করি। কিন্তু তাঁহাদের কোটপ্যাণ্টধারী যুবা সঙ্গী আসিয়া ফারসীভাষায় কি বলিয়া গেলেন, তাহাতে ভামিনীগণ আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিকটে বসিতে কহিলেন। বুরকা আচ্ছাদিত মুখ ক'খানি দেখিবার জন্ত উৎসুক হইয়াছিলাম। ট্রেণ ছাড়িল, মুখের পরদা খুলিল। গ্যাসের আলোকে স্বভাবতঃ সুন্দরী ইরাণী মহিলাগণের রূপের জ্যোতি আরও যেন ফুটিয়া উঠিল। ক্রমে আমার সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। পরিচয়ে জানিলাম ছুটী সুন্দরী পরস্পর সপত্নী। সতিনীদ্বয় সমবয়স্কা। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনারা ত কখনও কিছু লইয়া বিবাদ করেন না?' তৃতীয়া রমণী—উঁহাদের ননদ—কহিলেন, "তাহা হইলে স্বামী যে পিস্তল দিয়া মারিয়া ফেলিবে। মনে মনে ভাবিলাম, কাবুলির প্রেম ও সুবিচার বুঝি এমনই!

এইরূপ কথাবার্ত্তায় পথটুকু শীঘ্রই ফুরাইল। দুই পার্শ্বে অন্ধকারময় ভূমি, তার মধ্যে কেবল জোনাকি উড়িয়া উড়িয়া নীলাকাশে নক্ষত্রবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক রজনীশোভা আর অধিকক্ষণ দেখা ঘটিল না। আম্বালা আসিয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে জানিতাম, ইহার সংলগ্ন ট্রেণ পাইব না। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন, দেখি যে গাড়ী একেবারে প্ল্যাটফরমে হাজির। রাত্রি তখন ১০টা। আমরা তখনই গাড়ী বদল করিয়া শাহারাণপুরের গাড়ীতে উঠিলাম।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

আহ্বান।

শরৎ এসেছে ফুটিয়াছে চাঁদ,
আজি হাসিতেছে ধরণী।
মাধুরী ছড়ায়ে উজলিয়া গৃহ
আজ এস তুমি সজনি!
নূপুর বাজিবে রিণি রিণি,
কাঁকন বাজিবে কিনি কিনি,
সেফালিকা কেশে, এস মৃদু হেসে,
মধুময় হোক্ রজনী।

জোৎস্না-আলোকে কুসুম কলিকা
হের সখি উঠে ফুটিয়া,
আকুল পবন নিভৃতে আসিয়া
পরিমল লয় লুটিয়া।
বকুল শাখায় ডাকে পিক,
পাপিয়া কণ্ঠে ভরা দিক,
তর তর তর বহিছে নিঝর
প্রেমভরে যায় ছুটিয়া।

সুন্দর আজি সবি মনে হয়,
প্রকৃতি যেন গো হাসিছে।
নিখিল ভুবন যেন মনে হয়
কি নব হরষে ভাসিছে।
চাঁদ ঢালে বসি' সুধারাশি,
দূরে ওই কার বাজে বাঁশী,
বুকভরা তান মিলনের গান
পবনে ভাসিয়া আসিছে।

এ মধু যামিনী কেমনে যাপিব
সখিলো তোমার বিহনে,
স্মৃতি লয়ে শুধু থাকিব কি ভুলে'
আজি হায় মিছে স্বপনে!
শরতের মত সখি আজি
শুভ্র বসনে এস সাজি',
মিটুক তিয়াসা পরাণের আশা,
ফুটুক হাস্য বদনে।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দশম পরিচ্ছেদ।

কয়েক দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে শোভা আসিয়া বলিল, "মিস্ বসু, আজ আমাদের ছুটী।" আমি বলিলাম, "কেন?" শোভা হাসিয়া বলিল, "আজ যে আমরা বার্চ্চ হিলে পিকনিকে যাব!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে কে যাবে?" শোভা বলিল, আমরা সবাই যাব, মিঃ রায় যাবেন, আর মিসেস্ মুখার্জ্জিরা যাবেন।" সে চলিয়া গেল, আমি বসিয়া রহিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে সুধা সেই ঘরে আসিয়া বলিলেন, "মিস্ বসু, আপনি কি পিক্‌নিকে যাবেন?" আমি নিরুত্তরে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। আমি এ প্রকার আমোদ প্রমোদে যোগ দিবার উপযুক্ত নই, তাহা জানি, তবু এ সংবাদে আজ আমার বাসনা এমন চঞ্চল হইল কেন? আমায় নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া সুধা পুনরায় বলিলেন, "আমায় মা বলিয়া দিলেন, আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন, মিঃ রায় মাকে অনুরোধ করিয়াছেন।" এই কথায় আমার মুখে যে লজ্জার ভাব জাগিয়াছিল তাহা বোধ হয় গোপনে রহিল না, আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "আমি না গেলে ক্ষতি কি?"

"কেন, যাইবার ইচ্ছা নাই?" "তা নয়, তবে"—"তবে আর কি? আমি চলিলাম, যাবার ইচ্ছা হয় ত প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।" সুধা চলিয়া গেলেন।

তাহার পর লীলা আসিয়া বলিল, "মিস্ বসু, মিঃ রায় তোমাকে পিক্‌নিকে যেতে বলেছেন, নিশ্চয় যেতে হবে। তুমি যাবে ত?"

আমি কি বিপদে পড়িলাম! আমার যাইবার কোন অনিচ্ছা নাই, শুধু ভয় হয়; কিন্তু আমি যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আর উঠিবার ক্ষমতা নাই। এই মুহূর্ত্তের আনন্দ, কেন তা'তে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হইব? আমাদের যাইবার সময় হইল।

মিসেস্ চৌধুরী আমায় ডাকিলেন, আমি কুণ্ঠিত ভাবে বাহিরে আসিলাম। মিঃ রায় ও মিসেস্ চৌধুরীর জন্য রিক্‌স ছিল। তাঁহারা কিয়ৎদূর পদব্রজে ও কিয়ৎদূর রিক্‌সতে গেলেন। আমরা সব পদব্রজে চলিলাম, দার্জ্জিলিংএর স্বভাবসৌন্দর্য্য যেন আরও কত সুন্দর দেখাইতেছিল, সেই ঘনচ্ছায়াবৃত অবিরাম বিহগকূজিত মনোরম স্থানে দাঁড়াইলে যেন মনে হয়, এ কোন্ স্থানে আসিলাম! সে স্থান হইতে উপত্যকা কত নীচে মনে হইতেছিল; আমরা যেন উপরে রহিয়াছি, মেঘখণ্ড সব নীচে নীচে ভাসিতেছে। চারিদিক মনোহর ফার্ণের গাছে পরিপূর্ণ, কোন কোন ফার্ণ যেন রৌপ্যনির্ম্মিত, কোনটী বা যেন সুবর্ণের মত দেখাইতেছে। পর্ব্বতের গাত্রে চেরি গাছ, তাহাতে ফল ঝুলিতেছে, বালক-বালিকারা তাহাই তুলিতে ব্যস্ত হইল। সেই অযত্নে পতিত স্থান যেন সযত্নে পালিত উদ্যানের মত দেখা-ইতেছে। চারিদিকে সুদীর্ঘ পল্লবশোভিত ঘন বার্চ্চ গাছের শ্রেণী। কত প্রকার ঝাউয়ের গাছ, সেই সব গাছে কত অর্কিড ফুলের গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে। কত স্থানে পুষ্প মুকুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা বার্চ্চ হিলের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলাম, একটি পরিষ্কৃত স্থানে বসিবার স্থান হইল। সকলেই একটু বিশ্রাম করিয়া, জলযোগ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আমিও শোভা লীলাকে লইয়া অগ্রসর হইলাম, মিসেস্ চৌধুরী আমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি যেন তাহাদের কাছ ছাড়িয়া অন্য স্থানে না যাই। শোভা লীলা কি স্থির থাকিবার মেয়ে? অন্য সকলে একটু দূরে গমন করিলেই তাহারা ছুটিতে আরম্ভ করিল, আমি পিছাইয়া পড়িলাম। সহসা পশ্চাতে পত্রের মর মর শব্দে আমি ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম মিঃ রায়। তিনি আমার নিকটে আসিয়াই আমার হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন, আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি বলিলেন, "আমার একটি অনুরোধ রাখিতেই হইবে।" সে দৃষ্টির তলে দাঁড়াইতে আমি অক্ষম হইয়াছিলাম, তবু মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "কি?" তিনি বলিলেন, "কাল এমনি সময়ে এক বার ম্যালের নিকট আসিবেন, কাহাকেও কিছু বলিবেন না, এক জনের জীবন-মরণের বিষয় জানিয়া আসিবেন, বুঝিলেন?"

আমি যেন মন্ত্রাহত হইয়া গেলাম, কোন উত্তর করিতে পারিলাম না।

তিনি পুনরায় বলিলেন, "এটুকু বিশ্বাস আমার উপর নাই ?"

আমি লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "ওকথা বলিবেন না।" তিনি বলিলেন, "তবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলুন আসিবেনই ?" শোভা ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া বলিলাম, "আসিব।" তিনি হাত ছাড়িয়া দিলেন, আমার হৃদয়ে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। শোভা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "লীলা পড়িয়া গেছে, কাঁদিতেছে।"

আমরা দ্রুতপদে শোভার সঙ্গে চলিলাম, অদূরে লীলার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অন্য প্রান্ত হইতে মিসেস্ চৌধুরী আসিয়া পড়িলেন। তিনি মিঃ রায়কে আমার নিকট দেখিয়া যে তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন, তাহাতে আমার অন্তঃস্থল বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "আপনাকে না বলিয়াছিলাম, একটু উহাদের দেখিবেন, তা' বুঝি পারেন নাই ? কেবল গল্প করিতেছেন ?"

মিঃ রায় বলিলেন, "মিস্ বসু ত উহাদের সঙ্গেই আছেন। শোভা লীলা হঠাৎ ছুটিয়া গেল, তাই বোধ হয় উহাদের সঙ্গে ছুটিতে পারেন নাই।"

মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন, "আপনি বুঝি বরাবর সঙ্গে আছেন ?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "না, আমিও ত এই মাত্র এই স্থানে আসিলাম।" আমি লীলাকে শান্ত করি[illegible] লাম, লীলা রিকৃস করিয়া মিসেস্ চৌধুরীর সহিত গে[illegible]

সন্ধ্যার সময় আমরা গৃহে ফিরিলাম। শোভা [illegible]লা মায়ের কাছে গেল। আমি ধীরে আমার বাক্স খুলি[illegible] সেই ছবিটি বাহির করিয়া অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লা[illegible]ম। আমি এত মোহে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, লীলা যে কখন আসিয়াছে, জানিতে পারি নাই, সে আসিয়া আমার গলদেশে হাত রাখিয়া কহিল, "মিস্ বসু, এ মিঃ রায়ের ছবি, তুমি কোথায় পাইলে ?"

আমি চমকিত হইয়া, ছবি রাখিয়া ফিরিলাম। তাহার পর লীলার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম, "লীলা, তুমি কি করিয়া জানিলে এ মিঃ রায়ের ছবি ?"

সে হাসিয়া বলিল, "হাঁ আমি জানি, আমি দেখেছি।"

আমি কি বলিব, সত্য মিথ্যা কি বলিব ভাবিয়া পাই না; লীলা পুনরায় বলিল, "মা তোমার উপর বড় রেগেছেন,—কেন মিস্ বসু তুমি অত মিঃ রায়ের সঙ্গে মেলা মেশা কর, আজ মা এখনি দিদিকে বল্‌ছিলেন, তুমি বড় দুষ্টু।"

আমি লীলাকে বলিলাম, ছিঃ লীলা, মার কথা এসে বলিতে নাই।" তাহাকে একটা গল্প বলিয়া ভুলাইতে লাগিলাম, শোভাও আসিল, দুজনে গল্প শুনিতে ব্যস্ত হইল। তাহারা দুই জনে ঘুমাইলে আমার অবসর হইল।

আ[illegible]ন এক বার আসিয়া গবাক্ষের নিকটে দাঁড়াইয়া পর্দা সরাইয়া দেখিলাম, শান্ত জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনী সুপ্ত রহিয়াছে, বাহিরে প্রকৃতি শান্ত, কিন্তু আমার হৃদয় এত দুর্দান্ত হইল কিসে ? কিসের ভাবে, কিসের উচ্ছ্বাসে আমার প্রাণ যেন আমার বশে থাকিতে চায় না। চক্ষু চাহিয়া দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি, সেই এক মুখ দেখিতেছি, শ্রবণে সেই একই ভাষা, হস্তে সেই মধুর মোহময় স্পর্শ। আমার শান্ত মন কে এমন করিয়া চঞ্চল করিল ? কে এরূপে জীবন-নদীতে জোয়ার আনিয়া দিল! আমার সবই বুঝি ভাসিয়া যায়, আমি যে কত ক্ষুদ্র, কত দীন আমায় বুঝি আজ তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়! কাল দেখা করিতে বলিয়াছেন, এক প্রকার শপথ করাইয়া লইয়াছেন। কি কথা ? আমি কি বুঝিতে পারি না ? সে অতৃপ্ত নয়নের দৃষ্টি, সে কম্পিত হস্তের স্পর্শ, আমি যে দর্পণের মত সে হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়াছি, আমার নিকট আর কিছু গোপন নাই।

আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সুধা সেই গৃহের পর্দ্দার নিকট হইতে ডাকিলেন, "মিস্ বসু!" আমি হৃদয়কে সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলাম, "কি বলিতেছেন ?"

তিনি গৃহের মধ্যে আসিয়া বলিলেন, "আসুন না একটু গল্প করি, আপনি কি করিতেছিলেন ?"

আমি বলিলাম, "কিছুই না।" তিনি বলিলেন, "আপনি বুঝি ইহার পূর্ব্বে কখন বার্চ্চ হিলে জান নাই ?"

"না।"

"এই কি প্রথম দার্জ্জিলিংএ এসেছেন?"

কি জানি এসব কি প্রশ্ন!

আমি বলিলাম, "না ইতিপূর্ব্বে আর এক বার এসেছিলাম।"

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সে কি, কবে? কোথায় ছিলেন?

আমি ধীর ভাবে বলিলাম, "সে সব কথা বলিবার কিছু প্রয়োজন আছে কি?"

"কেন, তাহা কি বড় গোপন কথা নাকি?"

আমি নিরুত্তরে রহিলাম।

"আচ্ছা মিঃ রায়ের সঙ্গে কি আপনার দার্জ্জিলিংএ সাক্ষাৎ হয়েছিল?"

এ সব কি প্রশ্ন? আমি ত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

সুধা পুনরায় বলিলেন, "মায়ের ত চিরদিনের সাধ, দিদির সঙ্গে মিঃ রায়ের বিবাহ হয়। আজ কয়েক বৎসর ধ'রে আমরা আশা করে আছি, এত দিন ত ভাবছিলাম বিয়ে হবে, কিন্তু মিঃ রায়ের দেখ্‌ছি আপনার প্রতি বড় টান"—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনারা আমাকে আশ্রয়ে রেখেছেন, তা ব'লে কি আপনার আমায় এসব কথা বলা উচিত হচ্ছে?"

সুধা বলিলেন, "মা তাই ত বলিতেছিলেন; আশ্রয় দিয়ে তিনি যে এমন বিপদে পড়িবেন তা' ত জানিতেন না। আর মিঃ দত্ত যখন আপনার কথা বলেছিলেন, তখন আপনি যে এত সুন্দর ও আপনার বয়স এত অল্প, মা তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।"

পরাশ্রয়ে থাকার কত সুখ! সুধা স্পষ্ট না বলিয়া আভাসে জানাইতেছেন, আমি তাঁহাদের বাটীতে থাকিবার উপযুক্ত নই।

আমি বলিলাম, "আপনারা আমার প্রতি যা দয়া করিয়াছেন তাহা ভুলিব না। আমি এ সংসারে আর কাহাকেও জানি না, মিসেস্ দত্ত আমার মাতৃস্বরূপিনী ছিলেন, তিনি যে আমায় এমন ভাবে অকূল সংসারে ফেলিয়া যাইবেন তাহা কখনও ভাবি নাই। আমার অদৃষ্টের জন্য তিনি শীঘ্র চলিয়া গেছেন বলিয়া মনে হয়।"

সুধা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তাই ত, আজ মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিতেছিলেন, তিনি আপনাকে মিসেস্ বসুর বাটীতে দেখিয়াছিলেন। আপনার নাকি মিসেস্ বসুর ভাই সুরেশ রায়ের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হয়েছিল, নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, সব ঠিক, হঠাৎ বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল, আর আপনি নাকি চলিয়া গেলেন। ইহার অর্থ কি?"

আমি বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিলাম। মিসেস্ মুখার্জ্জিকে দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, কোথায় যেন দেখিয়াছি। কিন্তু বিবাহ করি নাই, তাহাতে আমার কি দোষ? আমি বলিলাম, "সে সব কথার উত্তর দিবার কি প্রয়োজন আছে?"

সুধা বলিলেন, "মা বলিতেছিলেন, যে লোক বাটীতে থাকিবে, তাহার সম্বন্ধে কোন রহস্য থাকিলে জানা আবশ্যক। মিঃ দত্তও ত এসব বিষয়ে কিছু বলেন নাই!"

আমি বলিলাম, "আমি কাজ করিতেছি, আমার কার্য্য যদি পছন্দ না হয়, মিসেস্ চৌধুরী অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারেন। মিঃ দত্ত আমাকে কন্যার স্নেহে তাঁহার নিকট রাখিয়াছিলেন, তিনি আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন, তাঁহাকে সব জিজ্ঞাসা করিলেই আমার রহস্যকথা জানিতে পারিবেন।"

সুধা বলিলেন, "আমি মাকে তাহাই বলিব, তবে আমি আশা করি মিঃ রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া দিদির বিবাহটা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন না।"

আমি আর সহিতে পারিলাম না; বলিলাম, "আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন, আমি ততদূর ঘৃণিত নীচ নই, যে আপনারা আমায় যাহা মনে করিতেছেন তাহা হইব। আপনারা নিশ্চিন্ত হইবেন, আমি যত শীঘ্র পারি আপনাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করিব।"

"সুধা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "মিসেস্ বসু ত কাল দার্জ্জিলিংএ আসিতেছেন, কাল সব জানিতে পারা যাইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সেই রাত্রে আর আমার ঘুম হইল না। সারারাত মনের ভিতর দুইটি ভাবের কি ভীষণ আন্দোলন হইতেছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কাল দেখা করিব, যদি দেখা

করি তাহা হইলে কি বলিবেন? যদি যাই, আর মিসেস্ চৌধুরী যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি বলিবেন? মিসেস্ বসু আসিতেছেন, আর আমিও দার্জ্জিলিংএ। আমি যে কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। এ সংসারেও আমি আর কাহাকেও জানি না। যাঁহারা আমার আত্মীয় স্বজন, তাঁহারা আমায় অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত সংবাদ লন নাই। তাঁহারা সব কে কোথায় আছেন তাহাও জানি না। শেষ রাত্রে পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম, তাহাও দুঃস্বপ্নে পূর্ণ; দেখিলাম মিঃ রায়ের অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অসুখ, বাঁচিবার কোন আশা নাই, আমি কোন উপায়ে কোনও সংবাদ পাইতেছি না, এইরূপ নানা দুর্ঘটনা দেখিয়া আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলাম, প্রভাত হইয়াছে, আমার হৃদয়ে যেন একটা আকুলতা জাগিয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি প্রাতঃকালে শোভা ও লীলাকে পড়াইতেছিলাম, এমন সময় বেহারা আসিয়া আমার হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল। আমি কম্পিত হৃদয়ে খুলিলাম, অনুমানে বুঝিলাম কে লিখিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখিত ছিল ঃ—

"আপনার প্রতিজ্ঞা ভুলিবেন না। এই এক বার আমার অনুরোধ রাখিবেন। আজ যদি সাক্ষাৎ না করেন, আমি সন্ধ্যাকালে আসিয়া মিসেস্ চৌধুরীর নিকট আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিবই, ইহা স্থির জানিবেন।" আমি তাড়াতাড়ি সে পত্রটুকু তুলিয়া রাখিলাম। ছিঁড়িতে সাধ্য হইল না, ভালরূপে পড়িতেও সাহস হইল না। সেদিন শোভা লীলাকে অতি কষ্টে কোনরূপে পড়াইলাম। তাহার পর তাহাদের নিকট শুনিলাম, তাহারা মিসেস্ বসুকে আনিতে ষ্টেশনে যাইবে। মিঃ রায় সকাল হইতেই মিসেস্ বসুর জন্য বাটীর বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছেন, এবং তিনিও তাহাদের সঙ্গে ষ্টেশনে মিলিত হইবেন, এইরূপ কথা আছে।

তিনি যে সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা ঠিক ট্রেণের সময়। তিনি কি প্রকারে যাইবেন? আমি মনকে স্থির করিলাম যাবই, হয় ত এই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা হইবে। মিসেস্ চৌধুরীরা সকলে ট্রেণের সময় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহারা যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে বাহির হইলাম। জলা পাহাড়ের প্রারম্ভেই আমাদের বাটী ছিল, সেখান হইতে ম্যাল বহুদূর নহে। আমি ম্যালে উপস্থিত হইলাম, দ্বিপ্রহরে সে স্থান প্রায় নির্জ্জন, হোটেলে সে সময় টিফিন হয়। দু একটি মেম্ বা সাহেব বেঞ্চে বসিয়া আছেন। দু একটি আয়া শিশুদের ঠেলা গাড়ীতে লইয়া বেড়াইতেছে। আমি ম্যালের এক প্রান্তে যাইতেই দেখিলাম, মিঃ রায় অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে দেখিয়া দ্রুত পদে আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।" আমরা ধীরে ধীরে অব্জারভেটরী হিলের নিকট গমন করিলাম। তিনি বলিলেন, "আসুন, উপরে যাইব।" আমরা উভয়ে বাক্যশূন্যের মত সেই নির্জ্জন পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া, একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলাম। একটি ক্ষুদ্র বিশ্রাম করিবার স্থান, এক খানি কাঠের বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। দুই পাশে দুইটি উইলো মাথা নত করিয়া আছে। আশে পাশে নানা বর্ণের মনোহর ডালিয়া ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তিনি আমাকে বসিতে বলিলেন, আপনি দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মুহূর্ত্ত উভয়ে নীরবে রহিলাম। তাহার পর তিনি বলিলেন ঃ—

"আমার সহিত এইটুকু আসিতে কি বিশ্বাস হইতেছিল না?"

আমি যে কি বলিব, জানি না। নারীজনোচিত লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া আমি যে ছুটিয়া আসিয়াছি, ইহাই কি আমার পূর্ণ-বিশ্বাসের পরিচয় নহে? তিনি বলিলেন, "আপনি আমার এই প্রকার ব্যবহারে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন, কিন্তু আর সময় নাই; আর সময় নষ্ট করিতে পারিব না বলিয়াই আমি এত দুঃসাহসী হইয়াছি। আমি প্রায় মাসাবধি মিসেস্ চৌধুরীর বাটীতে রহিলাম, কিন্তু এক বারও কি আপনাকে দেখিয়াছি? আজ লিলি আসিবে, আমি আজ হইতে লিলির বাটীতেই থাকিব, তাই আজ ডাকিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আমিও আপ-

নার অনুরোধে আসিয়াছি। ভাণ্ডারায় যখন ছিলাম, আপনি আমার সামান্য অসুখেও প্রত্যহ সংবাদ লইয়াছেন, আর আমি আপনার অসুখের সংবাদ পর্য্যন্ত লইতে পারি নাই। সেজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। আশা করি আপনি কিছু মনে করিবেন না। আপনি কি বলিবেন তাই শুনিতে আসিয়াছি।" তিনি অন্যমনস্ক ভাবে একটা গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিলেন, আমার কথা শেষ হইলে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"শুনিয়াছ, সুরেশের বিবাহ হইয়াছে, সে মিস্ টমাস নামে এক জন ফিরিঙ্গীর মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে।"

আমি কি উন্মাদ হইয়াছি, না আমার বধিরতা জন্মিয়াছে ? 'শুনিয়াছ ?' আমাকে 'তুমি শুনিয়াছ ?' তিনি সহসা আমার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, সে চক্ষুতে যে ভাষা ফুটিয়া উঠিল, আর অন্য ভাষার কি প্রয়োজন আছে ? তিনি ধীরে ধীরে আমায় বলিলেন ঃ—

"আমি কি বলিব ? যদি বলি, বল রাগ করিবে না ?"

আমি বেঞ্চে বসিয়াছিলাম, সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমিতলে চাহিলাম। তাহার পর সহসা তিনি আমার চরণের নিকট নতজানু হইয়া বসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিলেন, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত ফিরিলাম, বুঝিলাম কি বলিবেন, লজ্জায় আমি আর চাহিতে পারিতেছিলাম না। বলিলেন, "মণিকা, আমার হৃদয় মন প্রাণ তোমাকে দিলাম, তুমি লইবে কি ?" মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, "আমায় দয়া করিয়া দিতেছেন ?" তিনি বলিলেন, "দয়া ? কার দয়া মণিকা ? সেই যে প্রথম দিন সেই প্রণয়পূর্ণ মুখ লইয়া তুমি "সুরেশ" বলিয়া আমার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলে, তখনি আমার হৃদয় মন প্রাণ তোমাকে দিয়াছি। কিন্তু পরের দ্রব্য বলিয়া সাহস করিয়া চাহিয়াও দেখিতে পারি নাই। কিন্তু লিলির মুখে শুনিলাম, তুমি কার ফটো দেখিয়া, কাকে ভালবাসিয়া, কাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিলে। (এই কথা শুনিয়া আমি লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকিলাম।) তখন আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিলাম। আমার ছবি যদি তোমার ভালবাসার দৃষ্টি পাইয়া থাকে, তুমি কেন আমায় ভাল বাসিবে না ?"

আমি বলিলাম, "মিঃ রায়, আপনার দয়াকে অশেষ ধন্যবাদ। মিসেস্ চৌধুরী আপনাকে এত সমাদর কেন করেন তা' কি জানেন না ?"

"সব জানি, তুমি মিসেস্ চৌধুরীর বাটীতে যে সুখে ছিলে, তাহাও জানিয়াছি। কিন্তু ভালবাসা ত আর অন্যের সমাদরে ভুলিবে না ? আজ তিন বৎসর ধরিয়া অহোরাত্র যাহাকে মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখিয়াছি, যাহার ভালবাসা পাইলে আমার জীবন ধন্য হবে, আমি ধন্য হব, সে যদি আমার না হয়, আমি আর কিছুই চাহি না।"

এত সুখ আমার ! আমি ভিখারিণী, আমি পরাশ্রয়ে লালিত, আমার অদৃষ্টে এই সুখ ? তিনি পুনরায় আমার হাত ধরিলেন, আমি আর চক্ষের জল লুকাইতে পারিলাম না। অতীত, ভবিষ্যত সব ভুলিয়া গেলাম, বর্ত্তমানের সুখস্বর্গে আমি চেতনা হারাইলাম। তাঁহার সেই আদরের ভাষায় আবার বলিলেন, "বল মণিকা, বল তুমি আমার হইবে কি না ?" আমি চক্ষের জল লুকাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল, আমি নিরুত্তরে রহিলাম।

তিনি বলিলেন, "যেদিন লিলি বলিল, তুমি সুরেশকে বিবাহ করিবে না। তুমি অন্যের ফটো দেখিয়া ভালবাসিয়াছিলে, তখন আমি তোমার ভালবাসার গভীরতা বুঝিলাম। তার পর যখন জানিলাম সে ফটো আমার, সে সময় আমার হৃদয়ে যে কি গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা তোমায় আমি জানাইতে পারি নাই, তখন আমি তোমায় প্রাণ দিয়া ভালবাসিলেও ভালবাসা জানাইতে অসমর্থ ছিলাম। আমি তোমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম, তোমার সহিত কথা কহিবারও অধিকারী ছিলাম না। তোমার স্মৃতি আমার মনের ভিতর একটি চিত্রের মত জাগিয়া ছিল।

তার পর সেই ভাণ্ডারায় দেখা হইল। সেই আশ্চর্য্য দেখা। আমি তোমাকে সেই আম্রকাননে দেখিয়া স্বপ্ন মনে করিয়াছিলাম। তখন মনে হইল, ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই আবার দেখা হইল। তুমি প্রাণের বন্ধনে টানিয়া লইয়াছিলে। তখনো আমি তোমাকে কিছু বলিতে পারি নাই। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়, তা' হলে আমার

মনে হয়, তুমি আমার প্রাণের কথা বুঝিয়াছিলে। তোমরা যখন ভাওয়ারা হইতে চলিয়া যাও, আমি তখন মিসেস্ দত্তকে সব কথা বলিয়াছিলাম। তিনি কত সুখী হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। তিনি থাকিলে আমাদের আর এত দিন দূরে থাকিতে হইত না। তাঁহারা যত দিন সিওনিতে ছিলেন, মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতাম। তাহার পর সহসা মিসেস্ দত্তের মৃত্যুসংবাদে ও মিঃ দত্তের ইংলণ্ডে গমন শুনিয়া আমি বজ্রাহত হইলাম। আমি অনেক বন্ধু বান্ধবকে লিখিয়া অবশেষে মিঃ দত্তের ঠিকানা জানিয়া, বিলাতে তাঁহাকে পত্র দিয়াছিলাম, ও তুমি কোথায় আছ জানিয়াছিলাম। মিসেস্ চৌধুরীদের আমি বহুকাল হইতে জানি। তাহার পর ছুটী লইয়া আসিব স্থির করিতে না করিতে, দারুণ পীড়ায় অসুস্থ হইয়া, দার্জ্জিলিংএই আসিলাম। যখন মিসেস্ চৌধুরী আমায় তাঁহার বাটীতে আনিতে চাহিলেন, আমি তোমার আশায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া বুঝিলাম, তুমি পর্দানশীন হইয়াছ। আমি সাহস করিয়া তাঁহাদের তোমার কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। শোভা ও লীলাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। তাহার পর তোমার গান শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় তাঁহারা তোমায় ডাকিলেন। আমি তোমার গান শুনি নাই? সেই গান এখনো আমার কাণে বাজিতেছে :—

"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো,
তুমি ছাড়া আর এ জগতে
কেহ নাই, কিছু নাই গো।"

সে কণ্ঠের সুধা-ধারায়, সেই কোন্ মোহময় আকর্ষণে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম। এখনো মনে পড়ে সেই প্রেমবিকশিত লজ্জিত মধুর মুখে, সেই সলাজ নয়নে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া তুমি অগ্রসর হইয়া আমার প্রতি কি ভাবে চাহিয়াছিলে! আর সেই কোমল মৃদুকণ্ঠে বলিলে, 'সুরেশ?' আমি সরিয়া গেলাম। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'সুরেশ নয়, সুধীর।' তখনি তোমার সেই মুখের ঘোরতর পরিবর্ত্তন দেখিলাম; যেন তোমার আশার আলো নিভিয়া গেল, মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

যখন সেই টিপাই হইতে ছবি উঠাইয়া দেখাইলে, তোমার হাত সুস্পষ্টরূপে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যদিও সেই প্রথম দেখা, সেই মুহূর্ত্তেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয় মন তোমাকে দিয়াছিলাম। প্রথম দর্শনে ভালবাসা আমি কবির কল্পনা মনে করিতাম বলিয়াই বুঝি আমার জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ ঘটিল। তার পর তোমার সেই প্রণয়ের মৃত্যু-সঙ্গীত, যেন আমার মনের প্রতিধ্বনির মত বাজিয়া উঠিল। আবার সেই যে দিন তুমি একাকিনী ট্রেণে চলিয়া গেলে, আমার শত আকুল ইচ্ছা সত্বেও আর আমি তোমার সহিত কথা কহিতে পারি নাই। এক বার চকিতের মত তোমার ম্লান মুখ দেখিয়াছিলাম। আর কত কথা বলিব? আমার নিদ্রা বা জাগরণ তোমাতে পূর্ণ হইয়াছে, তোমাবিহনে আমার জীবন বিফল হইয়াছে। আর এ বিফল আকুলতা বহিতে পারি না। তুমি সব ভালবাসা যদি ছবিকে দাও, আমার দশা কি হইবে?"

আমি বলিলাম, "আমার কি আছে, যে আমি আপনার ভালবাসার উপযুক্ত হইলাম?"

তিনি বলিলেন, "আমার ছবির কি ছিল, যে তুমি তাহাকে ভালবাসিলে?"

"আমি তা জানি না।"

"আমিও তা'হলে জানি না।"

"মিসেস্ বসু শুনিয়া কি বলিবেন? মিসেস্ চৌধুরীরা কি বলিবেন?"

"লোকের কথার ভয়ে বহুদিন দূরে দূরে থাকিয়া, হৃদয়ে অনল জ্বালাইয়াছি, আর ত লোকের কথার ভয়ে চলে না। আমি আজ গিয়াই মিসেস্ চৌধুরীকে বলিব, ও লিলিকে গিয়া সব বলিব। লিলির নিকট তোমায় থাকিতে হইবে।"

আমি সভয়ে বলিলাম, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন, মিসেস্ বসুকে কিছু বলিবেন না, বড় লজ্জার কথা হইবে।"

"বলিব না? ছুটী ত ফুরাইয়া আসিল, আর এক মাস আছে। তাহার পূর্ব্বে তোমায় আমার হইতে হইবে, বল, তা' হইবে কি না?"

আমি আবার দুই হাতে মুখ আচ্ছাদিত করিলাম। তিনি দু হাত টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "এক বার এদিকে চাও, বল তাহার পুর্ব্বে আমার হইবে কি না?"

আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি! আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিলাম। আমার যেন কথা আসিতেছে না, তবু বলিলাম, "আমায় পাইলে যদি আপনি সুখী হন, তাহা হইলে আমি আপনার মতেই সম্মত হইলাম।"

তিনি আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা'হলে তুমি এখনো আমায় ভালবাস? সুরেশের ব্যবহারে তাহার আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরাগ নাই?"

আমি বলিলাম, "সে কথা আর বলিবার কি প্রয়োজন? আপনি সবই জানেন; আমার হৃদয়ের গোপন কথা, যাহা কাহাকেও বলিবার নয়, তাহাও বহুদিন জানিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনি দয়া করিয়াই বুঝি এ শৃঙ্খলে জড়াইতে চাহিতেছেন।"

"মণিকা, এখনো বিশ্বাস নাই? এখনো অত দূরে রাখিতে চাও? এখনো সেই 'আপনি?' আমার ভালবাসার কি মূল্য নাই?"

সে আকুল কণ্ঠস্বরে, সে সোহাগের ভাষায় আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। আর আমার জয়েরই বা কি সম্ভাবনা ছিল? আমার হৃদয়ের আকুল বেদনা শুনিয়াই বুঝি জগদীশ্বর এমনি করিয়া আমার দুরাশা-স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করিলেন। আমি যাহা কখনও ভাবি নাই, মনে করি নাই, আমার সেই আশা এমন করিয়া পূর্ণ হইবে, আমি তাহা যেন এখনো বুঝিতে পারিতেছি না।

তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমি আজ লিলিকে গিয়া সব কথা বলিব। সে এসে তোমায় মিসেস্ চৌধুরীর বাটী হইতে যত শীঘ্র সম্ভব লইয়া যাইবে। আমি কাল হইতে আবার হোটেলেই থাকিব। তুমি আশা করি এ বিষয়ে কোনও অমত করিবে না। যখন আমার জীবনের সঙ্গিনী হইবে, তখন আমি তোমায় যাহা বলিব তাহা শুনিতে হইবে, তাহা ত জান?"

আমি হাসিলাম, বলিলাম, "এখন হইতেই হুকুম শুনিতে হইবে নাকি?"

"সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে?"

তাহার পর আমাদের যাহা অনাবশ্যক কথা হইল, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার অনেকক্ষণ পরে সহসা আমার মনে হইল, কতক্ষণ আসিয়াছি, মিসেস্ চৌধুরীরা এতক্ষণ নিশ্চয়ই গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তাহারা আমার এত বিলম্ব দেখিয়া না জানি কি বলিবেন, আমি ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি এখনো অন্যের অধীন, আর আমার এত দেরি করিলে চলিবে না। এইবার ফিরিতে হইবে।"

"এখনি?" সেই প্রেম-আকুলতাপূর্ণ কাতর চাহনি আমার অন্তরে জাগিয়া রহিল। আমার জন্য এই সুখ-স্বর্গ ছিল, আমি কোন্ পুণ্যবলে আমার হৃদয়-দেবতার প্রণয় লাভ করিলাম! আমি বলিলাম, "আজ এখন না ফিরিলে কি করিয়া চলিবে?"

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "আচ্ছা চল তোমায় রাখিয়া আসি, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে তুমি আমার অধীন হইলে, তাহা বলিয়া যাও।"

আমি আর কি বলিব, নিস্তব্ধে ভূমি পানে চাহিয়া রহিলাম।

* * * * (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু।

মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের শোকে আজ সমুদায় বঙ্গদেশ নিমগ্ন হইয়াছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে তাঁহার জন্য শোকের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের কি দুর্দ্দিন! রাজ-নিগ্রহে, দৈব নিগ্রহে বঙ্গবাসী জর্জ্জরিত। এই দুঃসময়ে আনন্দমোহন বসুর ন্যায় স্বদেশ প্রেমিককে বিসর্জ্জন দেওয়া বড়ই পরিতাপের বিষয়। কিন্তু আবহমানকাল শুনিয়া আসিতেছি, "দুঃখ দুর্গতি এ সংসারে কখন একাকী আসে না।" তাই বুঝি এই জাতীয় দুর্দ্দিনে এই অশনিপাত! বঙ্গবাসী আজ শোক করিবে না ত করিবে কে? বিশেষ ভাবে বঙ্গ রমণীর আজ শোক করিবার দিন! তাঁহারাও



৺ আনন্দমোহন বসুর স্বর্গীয়া জননী।

শোক করিতেছেন। বিগত ১০ই ভাদ্র ময়মনসিংহ সহরে প্রায় তিন শতাধিক মহিলা সমবেত হইয়া মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্মরণার্থ এক সভা করেন। জনৈক বর্ষীয়সী হিন্দুরমণী সভানেত্রী হন। উক্ত সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের কোন রবিবারে ময়মনসিংহ সহরে আনন্দ-ক্ষেত্র নামে মহিলাগণের একটী সম্মিলনী হইবে। উক্ত সভায় মহিলাগণের শিক্ষা এবং উন্নতি বিষয়ে আলোচনা হইবে। এবং তৎসঙ্গে মহিলাগণের হস্তনির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যের এক প্রদর্শনী হইবে। এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য মহিলাগণের এক কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহের মহিলাগণ মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর প্রতি এই প্রকার সম্মান দেখাইয়া সমগ্র বঙ্গরমণীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং সমগ্র বঙ্গরমণীর কর্ত্তব্য কিয়ৎ পরিমাণে পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উক্ত সভার মহিলাগণ আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের সহধর্ম্মিনীকে যে সান্ত্বনা লিপি পাঠাইয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন ঃ—"মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যুতে ভারত আঁধার হইয়াছে, ময়মনসিংহ কাঙ্গাল হইয়াছে। কাঙ্গাল ময়মনসিংহের মহিলাদের মনের বেদনা যাহা বুঝিতেছি তাহা বুঝাইতে পারিতেছি না।" বঙ্গদেশ শুধু কাঙ্গাল নয়, বঙ্গরমণী বিশেষভাবে হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের এই আগষ্ট মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দমোহন ভূমিষ্ঠ হন। তিনি স্বর্গীয় পদ্মলোচন বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জন্মকালে তদীয় পিতা ময়মনসিংহে কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্গের সহস্র সহস্র বালকের শৈশব-শিক্ষা যেরূপে সম্পন্ন হয়, আনন্দমোহনের তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তৎপরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেন। এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিলেন। গণিতে এম, এ, পরীক্ষা দিলেন, তাহাতেও তিনি সর্ব্বাগ্রগণ্য হইলেন। অবশেষে 'স্কলারসিপ্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। বিলাতে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেঙ্গলার হইলেন। তৎপূর্ব্বে ভারতবাসী কেহ এ সম্মান লাভ করে নাই। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে ব্রাইটন সহরে ৫।৬ সহস্র লোকের সম্মুখে এক বক্তৃতা দেন, তাহাতে ফসেট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন। সকলে একবাক্যে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা স্বীকার করেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্ষে বর্ষে কত যুবা শিক্ষার্থী হইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। কত স্থলে তাঁহাদের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অভিভাবকদিগকে চক্ষের জল ফেলিতে হইতেছে। আনন্দমোহন বসু যে ভাবে ইংলণ্ডে কালযাপন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় পুলকিত হয়। সাধু যাঁহার প্রকৃতি তাঁহাকে বিকৃত করা সহজ নয়। ধর্ম্মপ্রাণ আনন্দমোহন ইংলণ্ডে গিয়া তাঁহার সে উচ্চ ভাব চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি "কোয়েকার"-দিগের উপাসনাস্থলে যাইতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। "কোয়েকার" সম্প্রদায়ের নির্দ্দিষ্ট কোন আচার্য্য থাকে না। সকলে উপাসনাগৃহে সমবেত হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে ধ্যান করেন, যদি কাহারও ভাবোদয় হয় তিনি প্রকাশ্যে উপাসনা করেন। অনেক সময় এরূপ হইত, তাঁহারা নীরবে দুই ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিয়া নীরবে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। এই নীরব উপাসনা আনন্দমোহনের বড়ই মিষ্ট লাগিত। এক বার দুই ঘণ্টাকাল নির্ব্বাক উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত বলিয়াছিলেন, "আহা কি আরাম!"—যখন অন্যান্য যুবকেরা আমোদের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিত আনন্দমোহন তখন কোয়েকারদিগের নীরব উপাসনায় যোগ দিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। অন্য আনন্দ তাঁহার বিমল হৃদয়ে স্থান পাইত না। এইরূপে ৪ বৎসর কাল ইংলণ্ডে নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন।

আনন্দমোহনের চরিত্রে তাঁহার জননীর প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। সন্তানের গৌরবে জনক-

জননীর গৌরব, বিশেষতঃ জননীর গৌরব। আনন্দমোহনের জননী এক দিকে যেমন তেজস্বিনী, অপর দিকে তেমন প্রচলিত ধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠাবতী ছিলেন। পতি তিনটী পুত্র এবং বিষয় সম্পত্তির ভার তাঁহার স্কন্ধে দিয়া গতাসু হন। তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাঁহার এই উভয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাহার নিদর্শন সুযোগ্য পুত্রত্রয় এবং শ্রীসম্পন্ন বিষয় সম্পত্তি। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই দুইটী আনন্দমোহনের জননীর বিশেষত্ব ছিল। পুত্রের চরিত্রে এতদুভয় গুণ কিরূপ পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই আনন্দমোহনের জননীর ভক্তিভাব সুব্যক্ত হইবে। একদা তিনি শকটারোহণে কোন মুসলমান পীরের সমাধির সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে যেই পীরের সমাধি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান হইল অমনি তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া সেই স্থানটুকু পদব্রজে গমন করিলেন। সকলে বলিল, "এ যে মুসলমান পীর!" তিনি উত্তর করিলেন, "হলোই বা মুসলমান, সব ধার্ম্মিকই নমস্য।" এইরূপ ভক্তিমতী জননীর গর্ভেই আনন্দমোহনের ন্যায় ভক্তিপ্রাণ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জননী জীবনের অধিকাংশ বৈধব্যে যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার "স্বর্গবাসী কর্ত্তার" নাম কেহ তাঁহার সম্মুখে উচ্চারণ করিলেই তিনি স্বর্গস্থ পতিকে উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, এবং পতির পদরজঃ কবজ করিয়া আজীবন হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন। কি পতিভক্তি!

পশ্চিম-বঙ্গবাসীগণ পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীদিগকে চিরদিন অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের ছাত্রাবস্থায় এই ভাব অতিশয় প্রবল ছিল। পূর্ব্ব-বঙ্গের আনন্দমোহন যেদিন এফ,এ, পরীক্ষায় প্রথম হইলেন সেই-দিন পূর্ব্ব-বঙ্গের ছাত্রকুলে জয়ধ্বনি পড়িয়া গেল। আনন্দমোহনের ন্যায় ছাত্রকে 'বাঙ্গাল' বলিতে আর কাহার স্পর্দ্ধা হইত না। তৎপর আনন্দমোহন বসুর দৃষ্টান্তে পূর্ব্ব-বঙ্গের ছাত্রদিগের ভিতর এইরূপ উৎসাহের সঞ্চার হইল, যে তাহার পরেই পূর্ব্ব-বঙ্গের রজনীনাথ রায়, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্ত, সারদানাথ হালদার প্রভৃতি ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। ইঁহাদের সকলের চরিত্রে আনন্দমোহনের প্রভাব আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য করিয়াছিল। আনন্দমোহনের সদ্দৃষ্টান্তের প্রভাবে রত্নমালা সদৃশ এই কয়টী নাম বঙ্গমাতার গলে শোভা পাইতেছে।

এই ত গেল তৎকালীন ছাত্রদিগের চরিত্রে আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের প্রভাব। তাঁহারই চেষ্টায় আজ বঙ্গদেশে শিক্ষিতা রমণীর আবির্ভাব। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া "ভারত-সংস্কার সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেই সভার অধীনে বয়ঃপ্রাপ্ত মহিলাদিগের জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তথায় যে আদর্শে, যে ভাবে স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা সকল বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে উচ্চ শিক্ষার আদর্শ তুলিয়া ধরিলেন। কুমারী এক্রয়েডের তত্ত্বাবধানে "হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয়" নামে নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। কুমারী এক্রয়েডের বিবাহের পর সেই স্কুল উঠিয়া যায়। এই সময় আনন্দমোহন বসু মহাশয় বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি দেশে আসিয়া স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া "বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। এই স্কুলটীর সমুদয় ব্যয় তাঁহারা উভয়ে বহন করিতেন।

নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কিছুই করেন নাই। মহাত্মা বেথুন কি পর্য্যন্ত না অর্থব্যয়, কি চেষ্টাই না করিয়াছিলেন? কিন্তু তাহাতে কি বিশেষ ফলোদয় হইয়াছিল? 'বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়' বেথুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়া বর্ত্তমান "বেথুন কলেজ" হইয়াছে। আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদি এত স্বার্থত্যাগ, এত অর্থব্যয় এবং এত চেষ্টা করিয়া নারীগণের উচ্চশিক্ষার স্রোত খুলিয়া না দিতেন, তবে বোধ হয় আজ উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গরমণী আরব্য উপন্যাসের অলীক কথার ন্যায় হইয়া থাকিত! এই যে নব যুগের অভ্যুদয়, ইহার মূলে কে? আনন্দমোহন বসু

এবং তাঁহার পূর্ব্ব-বঙ্গের বন্ধুগণ। পরে যখন ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য "ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়" স্থাপিত হয় তখন তিনি কত উৎসাহ দিয়াছেন, কত সহায়তা করিয়াছেন! যথার্থই আজ বঙ্গরমণীগণের বিশেষভাবে শোক করিবার দিন।

কেবল যে বঙ্গ রমণীগণই আনন্দমোহন বসুর নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধা, তাহা নয়। তিনি নানা বিভাগে নানা কার্য্য করিয়াছেন। যখন যে কার্য্য হস্তে লইয়াছেন, তখনই জনসাধারণের হিত অন্বেষণ করিয়াছেন। বঙ্গ-মহিলাগণের জন্য বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় বালকগণের জন্য সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট এবং সিণ্ডিকেটের সভ্য ছিলেন। এই সুযোগে তিনি শিক্ষা-বিভাগে অনেক সুসংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ অভিজ্ঞতা ছিল, যে মহামতি লর্ড রিপন তাঁহাকে "শিক্ষা-কমিশনের" ভারতীয় সভ্য নির্ব্বাচন করেন। এস্থলেও তিনি সুযোগ্যতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

আনন্দমোহন বসুর হাত কখন পরহিতকল্পে নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক বড়ই দুর্লভ। বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশ-প্রেমের এত উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে, কিন্তু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্বদেশ-প্রেম এরূপ বন্যার জলের ন্যায় স্রোতমুখে আসে নাই এবং বন্যার জলের ন্যায় শুখাইয়া যায় নাই। ১৮৭৬ সালে রাজনৈতিক চর্চ্চার জন্য আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি "ভারত সভার" প্রতিষ্ঠা করেন।

যৌবনের প্রারম্ভে যে উৎসাহ, যে উদ্যম প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা চির জীবনের সংগ্রামের পরেও বিন্দু মাত্র ম্লান হয় নাই। গত বৎসর ১৬ই অক্টোবরে বঙ্গবাসী তাহার সাক্ষ্য পাইয়াছে। বঙ্গ-মাতার এমন সুসন্তান কয়জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে?

মানবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্ম্মধন। পার্থিব সম্পদে ধনী না হইলেও এই শ্রেষ্ঠ ধনে তিনি ধনী ছিলেন। ধর্ম্মগতপ্রাণ আনন্দমোহন অন্তরে ঋষি ছিলেন, বাহিরে বিষয়ী। তাঁহার সমুদয় জীবন সাধনার ফল। তিনি মুখে ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সমুদয় জীবন প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিত। ঋষির বাক্যে শুনিয়াছি, "একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেন সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।" আজ সেই পরম সুহৃদ ধর্ম্ম তাঁহার অনুগামী হইয়াছে। পার্থিব যাহা কিছু ছিল তাহা আর নাই, আছে তাহার অমৃত চরিত্র।

শ্রীহেমলতা সরকার।

ভারত-মহিলা।

১

এক ধর্ম্ম যায়,—হয় অন্যের উত্থান;
জলে জলবিম্ব প্রায়   রাজা আসে,—রাজা যায়;
তুমি স্থির—অচঞ্চল; গৃহের কল্যাণ
সাধিছ। গৃহের সুখ তব পুণ্যদান।

২

আছে যুদ্ধ, আছে শান্তি, জয়-পরাজয়;
কল্যাণ কামনাবিনা,   অয়ি স্বেচ্ছাপরাধীনা,—
অন্য বাঞ্ছা হৃদে তব উদিত না হয়,—
তুমি স্থির,—তুমি ধীর,—কোমলহৃদয়।

৩

তুমি গৃহে লক্ষ্মী,—শক্তি হৃদয়ে সবার,
করুণার কমকান্তি,   নিষ্ঠুর যাতনে শান্তি,—
এজাতি এখনো জীয়ে জগৎ যাঝার—
সে শুধু তোমারিপুণ্যে—আশীষে তোমার।

৪

কর আশীর্ব্বাদ তুমি—সন্তানে তোমার
পা'ক শক্তি, ধৈর্য্য, ক্ষমা,   মনুষ্যত্ব, নিরুপমা,—
তোমার ও পূত রক্তে জনম যাহার
সে জাতি আশীষে তব জাগিবে আবার।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

আদর্শ পুরুষ আনন্দমোহন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন প্রথম কলিকাতায় আসি, তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য যেন তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অনেক লোক তাঁহার নিকট যাইত, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে অনেকেই সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের উপর তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রভাব সে সময়ে তেমন দেখা যাইত না। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সে সময়ে আর এক জন প্রধান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, তাঁহার আশ্চর্য্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধানক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিতাম, কিন্তু যুবকমণ্ডলীর জীবনের উপর তাঁহার কোন প্রভাবই লক্ষিত হইত না। মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র প্রধানতঃ জমিদারদিগের সভাতেই আবদ্ধ ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তখনও জীবিত, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব তখন ম্রিয়মাণ, তাঁহারও কোন প্রভাব যুবকদিগের মধ্যে ছিল না। কিন্তু পবিত্র চরিত্র, অদ্ভুত প্রতিভা ও অপূর্ব্ব বাগ্মিতাবলে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তখন চতুর্দ্দিকে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আর দেখিতাম, যুবকদিগের মধ্যে কয়েকটী পূর্ব্ববঙ্গবাসী, প্রতিভাশালী নীতিপরায়ণ যুবকের আশ্চর্য্য প্রভাব। সে সময়ে কলিকাতায় ছাত্রজীবন প্রশংসনীয় ছিল না। অতি অল্প যুবকেরই সৎকার্য্যে উৎসাহ ছিল। নানা প্রকার দুর্নীতি ছাত্রদিগের মধ্যে প্রবল ছিল, অধিকাংশ ছাত্রই অতি দুর্বিনীত ছিল। কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রগণই এ বিষয়ে প্রধান অপরাধী ছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও অন্যান্য অঞ্চলের ছাত্রগণকে তাহারা বিজাতীয় ঘৃণা করিত। আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, তখন এক জন সম্ভ্রান্ত বেহারী ছাত্রকে কলিকাতা অঞ্চলের ছাত্রগণ প্রথমে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে করিতে শেষে শ্রেণীর মধ্যেই অধ্যাপক লেথব্রিজ সাহেবের সম্মুখে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ছাত্রটীর অপরাধ, তিনি বেহারী। লেথব্রিজ সাহেব কিছুতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিলেন না, শেষে শাটক্লিফ সাহেব আসিয়া তাহাদিগকে থামাইলেন। কিন্তু এই সময়েও পূর্ব্বোল্লিখিত সাধুচরিত্র পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রগণ সাধারণ ছাত্রমণ্ডলীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমি যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখন স্বর্গীয় রজনীনাথ রায় এই উন্নতিশীল ছাত্রদলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আনন্দমোহন বসু আপনার সুতীক্ষ্ণ মেধা ও মধুময় চরিত্রপ্রভাবে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রগণের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই অল্প বয়সেই তাঁহার চরিত্রের প্রভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু সুগন্ধি কস্তুরী যেমন স্থানান্তরিত হইলেও বহুকাল আপন সৌরভ পশ্চাতে রাখিয়া যায়, তেমনই আনন্দমোহনের যশঃসৌরভে ও চরিত্র-সৌগন্ধে কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলী বিমোহিত। দেখিতাম, দুর্বিনীত ছাত্রগণও আনন্দমোহনের নামে মস্তক অবনত করে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কি ভাবে দিন কাটাই, কি ভাবি? দেশের প্রতি যে আমাদের কর্ত্তব্য আছে, তাহা চিন্তা করি কি না? আমরা তখন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতাম, ধর্ম্মজীবনের কথা কিছু কিছু ভাবিতাম, কিন্তু দেশের প্রতি যে আমাদের কর্ত্তব্য আছে তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে ভাবি নাই। আমরা বাড়ী গিয়া বলাবলি করিতে লাগিলাম, এ কথা ত আগে শুনি নাই! আলোচনা করিতে লাগিলাম, কি করা যায়? আনন্দমোহনই আমাদিগকে প্রথমে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন বিফলমনোরথ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিও ঐ কথাই বলিলেন। উভয়ে মিলিয়া দেশে নূতন প্রাণসঞ্চারের চেষ্টায় ব্রতী হইলেন।

আনন্দমোহন আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের অনুকরণে সভা স্থাপন কর, ধার্ম্মিক সজ্জনের জীবনী পাঠ ও আলোচনা কর, দেখিবে প্রাণের শীতলতা যাইবে, অন্তরে আগুণ জ্বলিবে। আমরা কয়েক জনে মিলিয়া ১৮৭৪ সনে এই উদ্দেশ্যে এক সভা স্থাপন করিলাম। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথ তাহার কাণ্ডারী হইলেন। ধীরে ধীরে দেশে স্বদেশ-প্রেমের আগুণ জ্বলিতে লাগিল। আনন্দমোহনের গভীর ধর্ম্মবিশ্বাসপূর্ণ তেজস্বী বাক্যে, আর সুরেন্দ্রনাথের ম্যাটসিনি, গ্যারীবল্ডী প্রভৃতির দৃষ্টান্তপূর্ণ উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় চতুর্দ্দিকে মহা আন্দোলনের উৎপত্তি হইল। বর্ষার নূতন জল আসিলে মাছগুলি যেমন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, নূতন আশা ও বিশ্বাসে যুবকমণ্ডলীর মন তেমনি নাচিয়া উঠিল। সেই সময়ে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব জাগিয়া উঠিল। আজ যে দেশে স্বদেশ-প্রেমের তরঙ্গ দেখিতেছি তাহা আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের অক্লান্ত শ্রমের ফল।

ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধদের মধ্যে রাজনীতির চর্চ্চা ম্লান হইয়া গেল। তখন মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ইঁহাদের হাতে রাজনীতি-চর্চ্চার ভার ছিল। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য ইঁহারা প্রায় সকলই অনুমোদন করিতেন ; কেবল যখনই গবর্ণমেণ্ট জমিদার-দিগের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করিতে যাইতেন তখনই তাঁহারা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিতেন। সে সময়ে দেশের প্রজাসাধারণের প্রতি কেহ কখন মুখ তুলিয়া চাহিত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রভৃতি মিলিত হইয়া জনসাধারণের কল্যাণের জন্য "ভারত সভা" স্থাপন করেন। সে দিনের কথা এখনও মনে আছে। সে দিন বেলা দুইটার সময় সুরেন্দ্র বাবুর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। মনে করিলাম, তিনি আর কি করিয়া সভায় আসিবেন ? কিন্তু ৪টার সময় দেখি, মহোৎসাহে সুরেন্দ্রনাথ সভাস্থলে উপস্থিত ! পুত্র-শোক শোক নয়, দেশের কাজ তাহারও উপরে—এদৃশ্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। প্রজার দুঃখ বর্ণন করিয়া ক্ষোভে ও দুঃখে সুরেন্দ্রনাথ সে দিন এমন বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যে সভাস্থলে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। ভারত সভা দেশের কি কাজ করিয়াছিল এখন অনেকে তাহা জানেন না। সে সময়ে প্রজাদিগের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। প্রজা ও ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ বিষয়ক আইন এমন ছিল, যে জমিদারগণ তাহাদের প্রতি অনায়াসে অত্যাচার করিতেন, কত প্রজার ভিটামাটি তখন তাঁহারা উচ্ছন্ন করিতেন ! এই আইন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এক পাণ্ডুলিপি গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত করেন, কিন্তু জমিদারগণ প্রতিবাদী হইলেন। আনন্দ-মোহনপ্রমুখ ভারতসভার সভ্যগণ তখন প্রজাদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। প্রজাগণকে তাঁহারা বলিলেন, "অনেক দিন তোমরা বিনাবাক্যব্যয়ে সকল যন্ত্রণা সহিয়াছ। এখন মুখ ফুটিয়া একবার আপনার দুঃখের কথা বল।" দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ভারত সভার রাজনৈতিক প্রচারকগণ প্রেরিত হইলেন। দশ হাজার পোনর হাজার লোক এক এক সভায় সমবেত হইতে লাগিল। তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। প্রজাশক্তির প্রভাব দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। তখন হইতে প্রজার পথ পরিষ্কার হইয়া গেল।

সার রিভার্স টমসন সে সময় বঙ্গের ছোটলাট। চৌকিদারদিগের বেতন তখন জমিদারগণ দিতেন। ছোটলাট ইচ্ছা করিলেন, গ্রামবাসীগণ চৌকিদারের বেতন দিবে, আর বঙ্গের প্রায় এক লক্ষ চৌকীদার পুলিসের ভৃত্য হইবে। আনন্দমোহনকে তখন গবর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় আইন-সভায় সভ্য মনোনীত করিয়াছেন। তিনি এই বিধির বিরুদ্ধে ভীষণ সমর ঘোষণা করিলেন। দেশের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক প্রচারকগণ যাইতে লাগিলেন। আনন্দমোহনের চেষ্টায় দেশে এমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, যে গবর্ণমেণ্ট চৌকীদারী আইন পরিত্যাগ করিলেন। এতদিন লোকে দেখিয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট যাহা ইচ্ছা করেন তাহা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত হয়। আনন্দ-মোহনের চেষ্টায় এই প্রথম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল।

উনিশ বৎসর বয়সে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা তখন প্রচলিত ছিল, আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের

চেষ্টায় ও আন্দোলনে পরীক্ষার্থীর বয়স বৃদ্ধি হইয়া ২৩ বৎসর হইল।

লর্ড লিটন মহা অনিষ্টকর মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া রাজকার্য্যের আলোচনা বিষয়ে এদেশবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিলেন। আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলন উপস্থিত হইল। টাউন হলে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইল। মহা উত্তেজনার সহিত গবর্ণমেণ্টের বিধির তীব্র প্রতিবাদ চলিতে লাগিল। এক জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বহুসংখ্যক পুলিস লইয়া সভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, লর্ড লিটনের হুকুম,—আন্দোলন কারীগণকে এখান হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইব। বিনয়ে আনন্দ-মোহন তৃণের সমান ছিলেন, তিনি সকলের পদতলের ধূলি হইয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন। সেই দিন সেই সভায় আনন্দমোহনের অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিলাম, কুসুম কেমন করিয়া বজ্রাদপি কঠোর হইতে পারে। তেজস্বিতার দীপ্তিমান প্রতিমূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রনির্ঘোষে আনন্দমোহন বলিলেন ঃ—"আজ যদি পল্টন আসে, কামানের গুলিতে আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে চাহে, তথাপি একটি প্রাণীও এখান হইতে নড়িবে না।" আনন্দমোহনের সাহসে সমস্ত সভায় বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হইল। রাজকর্ম্মচারীগণ ও পুলিস স্তম্ভিত হইয়া গেল। এইরূপে আনন্দমোহন এ দেশবাসীকে রাজনীতির চর্চ্চা শিখাইয়া গিয়াছেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে আনন্দমোহন যেমন মহা আন্দো-লনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যুবকমণ্ডলীর মধ্যে সত্যানুরাগ জন্মাইয়া দিবার জন্য, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য তাহা-দিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে তিনি তেমনই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, তিন চারি শত যুবককে সঙ্গে লইয়া আনন্দ মোহন ও সুরেন্দ্রনাথ কখনো বোটানিকেল গার্ডেনে, কখনো দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সমস্ত দিন যাপন করিতে যাইতেন। আনন্দমোহন সেখানে ধর্ম্মবীরদিগের জীবনী পাঠ করিয়া সকলের প্রাণে আত্মত্যাগের ভাব জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা জানি, তখন কত যুবকের প্রাণে নরনারীর কল্যাণের জন্য এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পাত করিতে সঙ্কল্প উদয় হইত। এক দিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমরা তিন চারি শত যুবক গিয়া-ছিলাম। আনন্দমোহন Renan-প্রণীত যীশুর জীবন চরিত হইতে যীশুর বধবৃত্তান্ত এমন করিয়া পাঠ করিলেন, যে আমি তেমন পাঠ আর দেখি নাই। তাঁহার মুখ রক্ত-বর্ণ, চক্ষে জলধারা বহিতেছে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি যীশুর জীবনের অন্তিম অবস্থা পাঠ করিতেছেন, তাঁহার বদন-মণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, চিত্রার্পিতের ন্যায় যুবকমণ্ডলী চারিধারে বসিয়া আছেন। আমাদের তখন মনে হইল, এই ভাবে জীবন সমর্পণ করিতে হইবে। আমাদের বন্ধু রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এক মাস পরে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "স্বপ্নে দেখি-লাম, আনন্দমোহন বাবু যীশুর বধবৃত্তান্ত সেই ভাবে পাঠ করিতেছেন, আমরা সেই ভাবে তাহা শুনিতেছি, আর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে।" এইরূপে কলিকাতার যুবকমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দমোহন নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন। যুবকমণ্ডলী তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক দিন বক্তৃতাকালে তিনি বাল্য-বিবাহের দোষকীর্ত্তন করিতেছিলেন। বাল্য-বিবাহে দেশের কি দুর্গতি ঘটিতেছে, তিনি অগ্নিময়ী ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতেছিলেন। এক দল যুবক সভাস্থলেই দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমরা কি করিতে পারি?" আনন্দমোহন বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা কর, বাল্যবিবাহ করিবে না।" তখনই এক সভা গঠিত হইল। মফঃস্বলের নানা স্থানে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল, শত শত যুবক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাঁহারা বাল্যবিবাহ করিবেন না। আনন্দমোহনের চরিত্রপ্রভাবে যুবকগণ তাঁহার এতই অনুগত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আনন্দমোহনের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। রাজা রামমোহন রায় যেমন ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য জীবন পাত করিয়াছিলেন, আনন্দমোহনও তেমনি ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ সাধনে আজীবন খাটিয়া গিয়াছেন।

এই বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এক আনন্দমোহন ব্যতীত রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত শিষ্য আর দেখিতে পাই না।

গভীর ধর্ম্মভাবে তিনি সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত থাকিতেন। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাদীপ্ত বদনমণ্ডল তাঁহার অমূল্য সাধন-সম্পদে, সুকোমল ভক্তিভাবে এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার দেশবিশ্রুত চরিত্র-মাধুর্য্য এই গভীর ধর্ম্মভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। বিদ্যাবুদ্ধি ও মান সম্ভ্রমে আনন্দমোহন এদেশে কাহারও নিম্নে ছিলেন না, অমায়িকতা এবং বিনয়েও কেহ তাঁহার সমকক্ষ নাই। নিজের জীবনকে ধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হন নাই, দেশের ধর্ম্মসংস্কারের জন্য আনন্দমোহন প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি কি না করিয়াছেন? মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তিনি আমাদিগের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের কথা আলোচনা করিতেন। তাঁহার দমদমার ভবনে যখন যাইতাম, আমাদিগকে তিনি বাগানের বৃক্ষতলে লইয়া গিয়া বলিতেন, "প্রার্থনা কর।" আমরা তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দিতে চাহিতাম, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে প্রার্থনা করিতে হইত। দেখিতাম, দর দর অশ্রুধারায় তাঁহার গণ্ডদেশ ভাসিয়া যাইত। জ্ঞান-ভক্তির এমন সমাবেশ আর ত দেখি না।

এদেশের স্ত্রীজাতির উন্নতি না হইলে দেশ যে উন্নত হইবে না, আনন্দমোহন তাহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে এবিষয়ে যে উন্নত আদর্শ তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা অনুসরণ করিবার জন্য দেশে আসিয়া তিনি প্রাণের সমস্ত আবেগ যেন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বেথুন কলেজে তখন বোধোদয় পর্য্যন্ত শিক্ষার দৌড় ছিল। আনন্দমোহন ও তাঁহার বন্ধু দুর্গামোহন মিলিত হইয়া "বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছিলেন। এক দিন তদানীন্তন ছোটলাট এই বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দুই জন দেশীয় ভদ্রলোকের চেষ্টা ও আগ্রহে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়ে উন্নত সাহিত্য, গণিত, ইতিহাসাদি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, আর গবর্ণমেন্টের রাশীকৃত অর্থ ব্যয় করিয়াও বেথুন কলেজে বোধোদয়ের বেশী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। তাঁহার আগ্রহে বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয় বেথুন কলেজের সহিত সম্মিলিত হইয়া বেথুন কলেজকে বর্ত্তমান উন্নত আকার প্রদান করিল। আনন্দমোহনের চেষ্টায় বঙ্গদেশে নারীর উচ্চশিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল।

এদেশের যুবকদিগকে উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সিটি স্কুল সংস্থাপন করেন। দুই বৎসর পরে ইহা কলেজে পরিণত হয়।

আনন্দমোহনের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ ছিল। অনেকে মনে করেন, তিনি শুধু ইংরেজীতে ও গণিতেই সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু আমরা জানি, বাঙ্গালা সাহিত্যেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কোন উৎকৃষ্ট নূতন বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইলে আগ্রহের সহিত তিনি তাহা ক্রয় করিতে ব্যস্ত হইতেন।

আনন্দমোহন কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। যখন মনে করি, তাঁহার শরীর কখন সবল ছিল না, অথচ কি অসাধারণ শ্রমই না তিনি করিয়া গিয়াছেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হই। সিটি কলেজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে দেখিয়াছি, রাত্রি একটা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, তিনি অনাহারে খাটিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের সময় দেখিয়াছি, তাঁহার অনেক সঙ্গী কঠোর শ্রমে ক্লান্ত হইয়া আর খাটিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি অক্লান্ত। এক দিন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কিরূপে এত অক্লান্ত ভাবে খাটিতে পারেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "এই জীবনটা ঈশ্বরের গচ্ছিত ধন। তিনি যে জ্ঞান, শক্তি ও ইচ্ছা দিয়াছেন তাহা যদি তাঁহার কাজে নিয়োগ না কর, তবে অপরাধী হও না? তাঁহার প্রদত্ত শক্তি তাঁহার সেবায় ব্যয় না করিলে মহা অপরাধ হয়।" বুঝিলাম তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তির মূল কোথায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ মনে করে, জীবনটা আমার নয়, শক্তি সামর্থ্য আমার নয়, সে ব্যক্তি কখনো চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

আমাদের চক্ষের সম্মুখে আনন্দমোহন তাঁহার জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; ঈশ্বরের বিশ্বাসী সেবকের ন্যায়, তাঁহার প্রদত্ত শক্তির সৎব্যবহার করিয়া

আমাদের সম্মুখেই এই আদর্শ পুরুষ জীবনের লীলা সাঙ্গ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ এ দেশের নরনারীকে অনুপ্রাণিত করুক।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

আছ।

১

ধরা ভরা ছিল অন্ধকার
সারা বিশ্ব ছিল ঘুমাইয়া,
দশ দিক ছিল স্তব্ধ, নাহি ছিল সাড়া শব্দ,
একটী পতঙ্গ কীট
উঠেনি জাগিয়া।

২

সে নীরব নিঝুম আঁধারে
তুমি নাকি কোথা গেলে চলি।
উদাসী বিদেশী সম, দিশাহারা নিরমম
একটী মুখের কথা
গেলে না'ক বলি!

৩

দিন শেষে যায় দিনমণি,
সে তো কত বলে ক'য়ে যায়,
বসন্ত বিদায় বেলা, করে না তো অবহেলা,
তুমি এত নিঠুরতা
শিখিলে কোথায়?

৪

পুনঃ যবে জাগিল তপন
স্নিগ্ধ নীল পূরব আকাশে,
প্রকৃতি-পাষাণ হিয়া, নাহি গেল বিগলিয়া,
তাই বিশ্বে প্রাণ দিল৷
অমৃত বাতাসে!

৫

আমি হায় শুনিনু অমনি
তুমি আর এ জগতে নাই,
অবসন্ন ধমনীতে না পারিল রক্ত নিতে
হৃদি পিণ্ড জলে' পুড়ে
হয়ে গেল ছাই!

* * * *

৬

সত্য কি গো জনমের মত
চলি গেছ?—তাও কভু হয়?
তা'হলে কি বাঁচি মরি, তা'হলে কি কাজ করি,
তা'হলে কি সে নিয়মে
এ ব্রহ্মাণ্ড বয়?

৭

না না—তুমি আছ আছ আছ!
চাঁদে আছে শারদ জ্যোছনা,
আছে পুণ্য, আছে ধর্ম্ম, আছে আজো সাধু কর্ম্ম,
আছে দয়া, আছে প্রেম,
অমর বাসনা।

৮

ওগো! তুমি আছ আছ আছ,
আমি শুধু পাই না দেখিতে,
পাই না সে স্নিগ্ধ হাসি, মধু মাখা কথারাশি
পাই না মনের মত
আদর করিতে।

৯

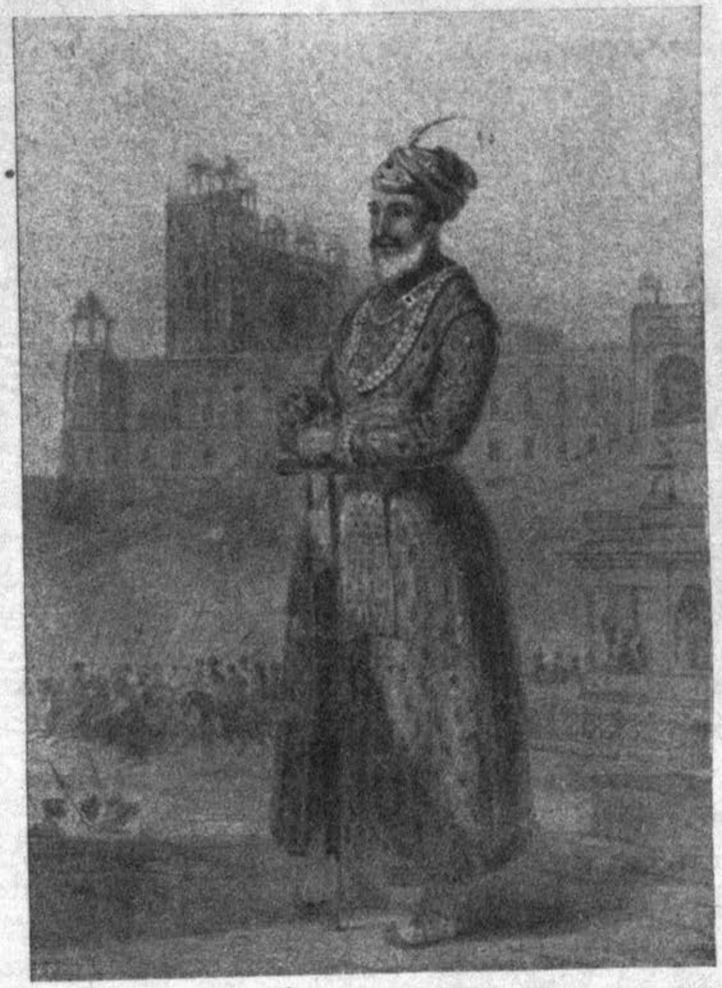
হোক,—তুমি আছ আছ আছ,
আছ তুমি দেবতা যথায়,
আছে সে প্রাণের টান, আছে সেই অভিমান,
আছে সে আপনা হারা
কথায় কথায়।

১০

ওগো! তুমি আছ আছ আছ,
আমি নাহি পাই সমাচার,
তবু জানি প্রাণাধিক, আছ তুমি বাস্তবিক,
তুমি আছ—আরো আছ
কেবলি আমার।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

৮৮(ক)



সম্রাট্ আকবর।

By kind permission of
the Editor of the *Indian World.*

৮৮(ক)

THE CHERRY

নুরজাহান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গীয়াসবেগের স্ত্রীর সম্পুর্ণ সুস্থ হইতে প্রায় দুই সপ্তাহ লাগিল। মালেক মসুদ এই দুই সপ্তাহ কাল সেই সরাইয়ে অবস্থিতি করিলেন। যখন তাঁহার শরীর পথ-কষ্ট সহিবার মত সবল হইল তখন তাঁহারা যাত্রা পুনরারম্ভ করিলেন। অতি প্রত্যূষে বিহঙ্গকুল ভগবান ময়ূখমালীকে অভিনন্দন করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিতেন এবং দিবসের উত্তাপ অসহনীয় হইবার পূর্ব্বেই বিশ্রামস্থান আশ্রয় করিতেন। সন্ধ্যাকালে স্নিগ্ধ বিমল চন্দ্রালোকে তাঁহারা পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিতেন এবং গভীর রজনীতে কোন সরাইয়ে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপন করিতেন। এইরূপে দীর্ঘকাল পথ চলিয়া এক দিন প্রাতঃকালে তাঁহারা লাহোর নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবর তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই গীয়াসবেগ লাহোরের আনন্দকোলাহল শ্রবণে ও আমোদ প্রমোদ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তুষারশুভ্র বসনপরিহিত যুবক মণ্ডলী আনন্দে মত্ত হইয়া সুরঞ্জিত ও সুবাসিত জল এবং গোলাপনির্য্যাসমিশ্রিত আবির পরস্পরের শরীরে নিক্ষেপ করিতেছিল।

পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গৃহশ্রেণী হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি ও সুললিত সঙ্গীতে সহরের বাতাস যেন মধুময় হইয়া উঠিতেছিল। সিপাহীগণ ও রাজবাড়ীর ভৃত্যগণ বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া গর্ব্বভরে রাজপথে বিচরণ করিতেছিল, এবং কখনও সুন্দরী পানওয়ালী, কখন বা হাবভাবময়ী নর্ত্তকীদিগের সহিত দু একটা রসিকতা করিতেছিল। আমীর ওমরাহগণের আড়ম্বরপুর্ণ সাজসজ্জায় রাজপথ যেন ঝলসিত হইতেছিল। বস্তুতঃ সমস্ত নগরী যেন হাস্য-কৌতুক ও রংতামাসায় ভাসিতেছিল।

গীয়াসবেগ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি! এ অতি আশ্চর্য্য সহর, আনন্দকৌতুকে যেন মাতোয়ারা!"

মালেক মসুদ উত্তর করিলেন, "হোলি ও নব বর্ষের উৎসব চলিতেছে। আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছিয়াছি। বাদশাহ কাল দরবার করিবেন, সেই দরবারে বোধ হয় আপনাকে বাদশাহের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব। আকবর বাদশাহ সর্ব্বজনপ্রিয়, এই নব বর্ষের উৎসবে সমগ্র জনসাধারণ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতেছে।"

"সকলেই যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। নিজের কথা আপনাকে আর কি বলিব? আমার দেহের সমস্ত লোম যদি রসনার আকার ধারণ করে তথাপি আপনার প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা সম্যক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। মহাশয়, এত জাঁকজমক, এত কোলাহল সত্ত্বেও যেন বোধ হইতেছে, আপনাদের এই সহরটী আরাম ও শান্তিপূর্ণ।"

"আমাদের এই সহর শীঘ্রই আপনারও সহর হইবে। তখন ইহা আপনার আরো প্রিয় হইবে।"—এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় এক দল বন্ধু ও অনুচর মালেককে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। মালেক উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া একে একে বন্ধুগণকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ভৃত্যগণকে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। বন্ধুবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া মালেক গীয়াসবেগের সহিত বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে মকমলাচ্ছাদিত সুকোমল আসন গ্রহণ করিলে পান-মসলা প্রচুরপরিমাণে চলিতে লাগিল। কারুকার্য্যখচিত রৌপ্য-নির্ম্মিত গুড়গুড়ির সুগন্ধি ধূমে গৃহ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

মালেকের প্রেরিত লোক পূর্ব্বেই গীয়াসের জন্য কয়েকটী গৃহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। বন্ধু বান্ধবের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মালেক গীয়াসকে সেই সকল গৃহ দেখাইতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "এ আপনারই বাড়ী, কোন প্রকার সঙ্কোচ না করিয়া স্বচ্ছন্দে বিশ্রাম করুন। কাল শুভলগ্ন দেখিয়া আমরা বাদশাহের নিকট যাইব। এখন আমি বিদায় হই।" মালেক চলিয়া গেলে একজন ভৃত্য আসিয়া সসম্ভ্রমে গীয়াসকে অভিবাদন করতঃ তাঁহার হস্তে গৃহস্থিত বাক্সগুলির চাবি প্রদান করিল।

গীয়াসবেগ বলিলেন, "এ চাবি ত আমার নয়, এগুলি তোমার প্রভুকে গিয়া দেও।"

"আমার প্রভু বলিয়াছেন, এ চাবি আপনারই।" এই কথা বলিয়া আবার গীয়াসকে সেলাম করিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল।

গীয়াসবেগ বিস্মিত নেত্রে তাঁহার পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তাঁহার পত্নী উত্তর করিলেন, "এগুলি তোমারই, দয়ালু মালেক ঐ সকল জিনিষ তোমায় উপহার দিয়াছেন।"

"কি দয়াল মানুষ! বন্ধুবরের এত অনুগ্রহ আমি কখনো কি পরিশোধ করিতে পারিব?" তাঁহার বেগম উত্তর করিলেন, "ঈশ্বরের দয়ার সীমা নাই, হয়তঃ কখনো এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা মালেকের কোন না কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিব।"

গীয়াসবেগ একে একে বাক্সগুলি খুলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বেগমের জন্য তন্মধ্যে কতকগুলি বহুমূল্য ও অনেকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ রহিয়াছে। অঙ্গরাগের উপকরণগুলি পর্য্যন্ত তন্মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

গীয়াসবেগ ও তাঁহার পত্নী কৃতজ্ঞ অন্তরে ভগবানের উপাসনা করিলেন এবং আহারান্তে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে মালেক মসুদের সহিত বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত বৃহৎ অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া গীয়াসবেগ নগরে বাহির হইলেন। মূল্যবান পরিচ্ছদধারী গীয়াসকে ইতিমধ্যেই অতি সম্ভ্রান্ত ওমরাহের ন্যায় দেখাইতেছিল।

তাঁহারা দেখিলেন, সমস্ত লাহোর নগরী অতি অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হইয়াছে। বাজার ও বাসভবনগুলি মূল্যবান সুরঞ্জিত বস্ত্রে সুশোভিত হইয়াছে। আনন্দোৎফুল্ল যুবকমণ্ডলী পথে পথে অসংখ্য সুগন্ধি কুসুম নিক্ষেপ করিতেছে, সমুদয় রাজপথগুলি কেবলই ফুলময়। ফুলের সুগন্ধে সমস্ত সহরটী এতই আমোদিত, যে এই মুহূর্ত্তে যেন সুপ্রসিদ্ধ খোটান নগরীর কস্তুরিকাপূর্ণ শকট সমস্ত সহরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুসজ্জিত, উন্নতদেহ রাজপুত রাজাগণ ও মোগল ওমরাহগণ মহা আড়ম্বরে পথ চলিয়াছেন, তাঁহাদের মস্তকোপরি সম্রাটের অনুগ্রহচিহ্নিত ছত্র। অগ্রে অগ্রে রৌপ্যমণ্ডিত দামামা বাদিত হইতেছে ও অনুচরবর্গ রৌপ্যনির্ম্মিত তরবারি ও স্বর্ণমণ্ডিত আশাসোটা ধারণ করিয়া গর্ব্বভরে চলিতেছে। রৌপ্যশিবিকার সুবর্ণসজ্জা, এবং হস্তী সমূহের স্বর্ণজড়িত আচ্ছাদন ও তদুপরি স্বর্ণাসনে হাওদার উপরে উপবিষ্ট রাজপুত রাজাগণ, সমুদয় মিলিয়া নগরের অতুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছিল। এই বর্ণনাতীত দৃশ্য দেখিয়া গীয়াসের অন্তর বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

সুরঞ্জিত লাহোরদুর্গ যেন অপূর্ব্ব স্বর্ণাবরণে আচ্ছাদিত হইয়াছে। তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়াতে বর্ণ ও কিরণের অপূর্ব্ব মেলা বসিয়া গিয়াছে। দুর্গমধ্যে অসংখ্য চন্দ্রাতপের সুবর্ণ-চূড়া কখন উজ্জ্বল তারকারাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে, সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে পরমুহূর্ত্তে আবার বিদ্যুচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে। অসংখ্য ভেরিনিনাদ কোন মঙ্গলানুষ্ঠানের সূচনা করিতেছে। রাবি নদীর অচঞ্চল জলরাশির উপর শত শত স্বর্ণভূষিত বজরা ভাসমান রহিয়াছে; তাহাদের বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত পতাকাগুলির প্রতিবিম্ব নিয়ে জলগর্ভে সহস্র রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে।

দরবার-ই-আমের প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে তাঁহারা যান হইতে অবতরণ করিলেন। অনেক সুসজ্জিত পথ ও বীথিকা এবং গৃহ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা অবশেষে দরবার সম্মুখবর্ত্তী দরদালানে উপস্থিত হইলেন। অসংখ্য আমীর ওমরাহ ও রাজকর্ম্মচারিবৃন্দে সে স্থান পরিপূর্ণ। তথায় শীঘ্রই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ ফৈজির সহিত মালেক মসুদের সাক্ষাৎ হইল। ফৈজি বলিলেন, "কি আনন্দের বিষয়! তোমাকে এ সময়ে পাইব, আমি একেবারেই আশা করি নাই। কিন্তু ভাগ্যদেবী এই নরোজার আনন্দ বৃদ্ধির জন্য আজ তোমাকে এখানে উপস্থিত করিয়াছেন। সম্রাট কতদিন তোমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন!"

মালেক মসুদ উত্তর করিলেন, "তোমার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। গৃহত্যাগী ফিরিয়া আবার গৃহে আসিয়াছে। আমার প্রিয় বন্ধু ত আজ আমাকে দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন! কিন্তু কই, তিনি ত এত দিন একটী বারও আমায় কোনও সংবাদ দেন নাই!"

ফৈজি বলিলেন, "ঈশ্বর সাক্ষী, তুমি আমার হৃদয়-মন্দিরে তোমার আসন স্থাপন করিয়াছ; যখনই আমি ইচ্ছা করিয়াছি, তখনই অন্তরে তোমার সঙ্গ লাভ করিয়াছি। আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিত, চিঠিতে কি তাহা বর্ণনা করা যায়?"

"অমৃতকণ্ঠ কোকিল, তুমি স্বর্গের অপ্সরাদিগকে ভূতলে ডাকিয়া আনিতে পার! যদিও প্রায় প্রতিদিন দূরে থাকিয়া আমি তোমার সহিত এবং তোমার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করিয়াছি, তথাপি আমি আবার তোমার ঐ শ্রীমুখের মধুর বাণী শুনিবার জন্য তৃষিত হইয়াছি।"

ইতিমধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত শুভ মুহূর্ত্তে আকবর স্নান করিলেন এবং সে দিন যে গ্রহের অধিকার ছিল সেই গ্রহের বর্ণানুযায়ী বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্র ভূষণ পরিধান করিলেন। কখন হিন্দু প্রথানুযায়ী, কখন মুসলমান প্রথামত মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। যথা সময়ে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বিবিধ বাদ্য ও কামান-ধ্বনি গভীর নিনাদে তাঁহার সিংহাসনারোহণবার্ত্তা প্রচার করিল। দরবার গৃহের কপাট উদ্ঘাটিত হইল এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দরবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সকলে যথাবিধি কুর্নিস করিয়া আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুসারে সিংহাসনের চারি দিকে আসন গ্রহণ করিলেন।

সে সিংহাসনের বর্ণনা করিতে ভাষা পরাস্ত হয়। স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত সেই সিংহাসনের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য রত্নাকর আপনার হৃদয়-রত্ন এবং মণিগর্ভ ভূধর আপনার হৃদয়-মণি উপহার দিয়াছিল। সিংহাসনের পদপার্শ্বে চারিটী রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহ দণ্ডায়মান থাকিয়া সম্রাটের মস্তকোপরি সুবর্ণচন্দ্রাতপ ধারণ করিয়াছে। সেই চন্দ্রাতপ হইতে হীরক ও চুমকিভূষিত মণিমালা সকল ঝুলিতেছে। সম্রাট বহুমূল্য পীতবর্ণ চোগা পরিধান করিয়াছেন। কটিদেশে দুর্লভ মণিখচিত কটিবন্ধ এবং মস্তকে হীরক-খচিত কীরিট শোভা পাইতেছে।

কিন্তু সকল সাজসজ্জা ও সকল আড়ম্বর অতিক্রম করিয়া আকবরের স্বভাবসুন্দর সুগঠিত দেহ শোভা পাইতেছে। তিনি প্রায় মধ্যমাকৃতি পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল যেন বীরত্বের আধার। সুপুষ্ট মাংসপেশী-গুলি যেন লৌহনির্ম্মিত। বদনমণ্ডলে সিংহের ন্যায় তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, কিন্তু এত তেজ ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক হইলেও সেই মুখে এক প্রকার মধুর কোমলতা দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার বিস্তৃত ললাটে যেন দৈবপ্রভা জ্বলিতে-ছিল। আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল যেন চতুর্দ্দিকে প্রীতি বিকীরণ করিতেছিল।

সম্রাটের বামপার্শ্বে শিশু সেলিম উপবিষ্ট। তাঁহার বয়স তখন মাত্র তিন বৎসর। তাঁহার নধর সুন্দর দেহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। তাঁহার পিতামাতা বিশ্বাস করিতেন, সাধু সেলিম চিস্তীর অনুগ্রহে তাঁহারা এই পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছেন, সেই অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ সেলিমের কর্ণে দুইটী স্বর্ণাঙ্গুরী শোভা পাইতেছিল।

সম্রাটের দক্ষিণে বিখ্যাত দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ পণ্ডিত আবুল ফজল ও তাঁহার নিকটেই তাঁহার ভ্রাতা ফৈজি দণ্ডায়মান ছিলেন। বাম পংক্তিতে লঘুচিত্ত সভা-সদগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, প্রত্যেক বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে তাঁহারা মস্তক অবনত করিতেছিলেন। দক্ষিণ পংক্তিতে গর্ব্বোন্নত বীর রাজপুতগণ দণ্ডায়মান। এক হস্তে তাঁহারা গুম্ফ আকর্ষণ করিতেছিলেন, অপর হস্তে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ সুদীর্ঘ সুশাণিত তরবারি। সিংহাসনের পশ্চাতে চামরব্যজনকারীগণ চামর ব্যজন করিতেছিল এবং যাঁহারা সিংহাসনের নিকটস্থ হইয়া কুর্ণীস করিতেছিলেন, নকীব তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান অনেকে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও ভেট প্রদান করিবার পর মালেক মসুদ ও গীয়াসবেগ সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। গম্ভীর স্বরে নকীব তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিল। সিংহাসনসমীপে অব-নতজানু হইয়া দক্ষিণহস্তে ললাট সংলগ্ন করিয়া তাঁহারা তিন বার সম্রাটকে সেলাম করিলেন। মালেক মসুদ পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরের হস্ত হইতে মণিমাণিক্য ও পুষ্পপূর্ণ পেটিকা গ্রহণ করিয়া এক বার তাহা সিংহাসনের সম্মুখে উত্তোলন করতঃ সিংহাসনের পাদমূলস্থিত স্তূপীকৃত মণি-মাণিক্যের সহিত রাখিয়া দিলেন।

প্রসন্ন দৃষ্টিতে আকবর মালেকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তুমি ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া আন-

ন্দিত হইলাম। আমি তোমার অভাব পুনঃপুনঃ অনুভব করিয়াছি। তোমার সঙ্গে উনি কে ?"

মালেক মস্থদ উত্তর করিলেন, "পরম কারুণিক শাহানসাহ দুনিয়ার মালিক যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই মেদিনী সুশাসন করুন। বাদশাহের দ্বারের ধূলিকণা মস্তকে ধারণাভিলাষী হইয়া এই সম্ভ্রান্ত পারস্য ওমরাহ ভারতে আসিয়াছেন ; বাদসাহের এই ক্রীতদাস তাঁহাকে বাদসাহের সম্মুখে উপস্থিত করিতে আস্পর্দ্ধাবান হইয়াছে। ইঁহার নাম গীয়াসবেগ। ইনি পারস্যরাজ তেহমাসাকের প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় মির্জা মহম্মদ সরিফের পুত্র। সম্রাট হুমায়ুন (যাঁহার অবস্থানে স্বর্গরাজ্য আলোকিত) যখন স্বীয় পদার্পণ দ্বারা পারস্য রাজধানী সম্মানিত করিয়াছিলেন তখন সুপ্রসন্ন ভাগ্যবলে ইঁহার পিতার সেই স্বর্গীয় বাদশাহ বাহাদুরের পরিচর্য্যা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সম্রাট হুমায়ুন সুপ্রসন্ন হইয়া ইঁহার পিতাকে একখানি অনুগ্রহ-লিপি প্রদান করিয়াছিলেন। আলোকে আকৃষ্ট হইয়া পতঙ্গ যেমন অগ্নির নিকট আগমন করে, ইনিও তেমনি আপনার স্বর্গীয় জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।"

গীয়াসবেগ পুনরায় জানু ভূসংলগ্ন করিয়া ললাটে ভূমি স্পর্শ করিলেন এবং তৎপর গাত্রোত্থান করিয়া আবুল ফজলের হস্তে পত্রখণ্ড অর্পণ করিলেন। গভীর শ্রদ্ধার সহিত মৃদুস্বরে তিনি পত্রখানি আকবরের নিকট পাঠ করিলেন।

আকবর আবুল ফজলের হাত হইতে পত্র গ্রহণ করিয়া তাহা চুম্বন করিলেন, এবং গীয়াসবেগের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আপনাকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। দুর্দ্দিনে যিনি আমার পিতার পরিচর্য্যা করিয়াছেন, আমার নিকট তাঁহার পুত্রের যথেষ্ট দাবী আছে।" সম্রাটের ইঙ্গিতে আবুল ফজল জনৈক অনুচরকে ইঙ্গিত করিলেন। অনুচর বহুমূল্য পোষাক ও উপঢৌকন লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আবুল ফজল তাহা গীয়াসবেগকে অর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমি আনন্দের সহিত আপনাকে সম্রাটের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি, তিনি আপনাকে তাঁহার পার্শ্বচর নিযুক্ত করিলেন।"

গীয়াসবেগ আবার সেলাম করিয়া বলিলেন, "প্রবল প্রতাপান্বিত পরম দয়ালু সম্রাট, বায়ু গুণ্ গুণ্ রবে আপনার মহিমা কীর্ত্তন করে, সূর্য্য স্বয়ং আপনার আজ্ঞাবহ, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ আপনার যশ কিরূপে কীর্ত্তন করিবে ?"

তৎপর সম্রাটের প্রতি সম্মুখ করিয়া পশ্চাতে হাটিয়া তিনি আপনার বসিবার স্থানে গমন করিলেন।

যথাবিধি দরবার শেষ হইলে আকবর গাত্রোত্থান করিলেন। রাজপুতগণ ব্যতীত সমগ্র ওমরাহমণ্ডলী ভূতলে লম্ববান হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তৎপর সকলকে লইয়া সম্রাট এক পটমণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্বর্ণ-তুলাদণ্ডে দ্বাদশ বার তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত তুলিত হইলেন। এই সমুদয় দ্রব্য এবং সিংহাসন সমীপে পুঞ্জীকৃত উপ-ঢৌকন সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল আরম্ভ হইল। এই সকল দান বিতরণ সমাপনান্তে সম্রাট আবুল ফজলের হস্ত ধারণ করিয়া বারান্দার উপরিস্থিত চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সম্রাট বাহিরের সাধারণ জনমণ্ডলীর দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবামাত্র তুমুল আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়া যেন আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সম্রাট সস্মিত মুখে মস্তক নত করিয়া জনমণ্ডলীকে প্রত্যভিনন্দন করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে শোভা-যাত্রা (procession) আরম্ভ হওয়া মাত্র জনকোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পঞ্চাশ সহস্র সুন্দর সুসজ্জিত হস্তী প্রথমে যাত্রা করিল। তাহার পশ্চাতে দ্বাদশ সহস্র সুসজ্জিত অশ্ব; তৎপর যথাক্রমে গণ্ডার, সিংহ, ব্যাঘ্র, কুকুর, বাজপক্ষী প্রভৃতি গমন করিল। সর্ব্বশেষে স্বর্ণজড়িত পোষাক পরিহিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল গমন করিল। সন্ধ্যাকালে শোভাযাত্রা শেষ হইল। সম্রাট তখন সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। আমীর ওমরাহগণকে তখন সুগন্ধি সরবৎ, ফল ও বিবিধ মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল, জলযোগের সঙ্গে নানা প্রকার কথোপকথন চলিতে লাগিল।

মালেক মস্থদ গীয়াসবেগকে বলিলেন, "আপনার এই

সম্মানে আমি পরম আনন্দিত হইয়াছি, নূতন পদে আপনার উন্নতি হউক, এখন এই কামনা।" গীয়াস উত্তর করিলেন, "প্রিয় সুহৃদ, আমাকে বাদশাহ কত অনুগ্রহ করিয়াছেন, আমি তাহার মূল্য বুঝি। এসকলই আপনার অনুগ্রহে। আমার নিকট ইহা যেন স্বপ্নের ন্যায় মনে হইতেছে!"

এই প্রকার কথোপকথনের মধ্যে এক জন মুণ্ডিত-গুম্ফশ্মশ্রু স্থূলকায় ব্যক্তি মালেক মসুদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "একি, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি, অথবা সত্য সত্যই আমার প্রিয় সুহৃৎ আমার সম্মুখে!"

"কেও, বীরবল! তুমি আকাশ থেকে পড়িলে নাকি? আমি সর্ব্বত্র তোমাকে খুঁজিলাম, কোথাও ত দেখিলাম না!"

"তোমার মন নিশ্চয়ই সপ্তম স্বর্গে ভ্রমণ করিতেছিল, নতুবা সম্রাটের পাশে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিশ্চয়ই আমাকে দেখিতে পাইতে। কি বল ফৈজি, আমি সেখানে ছিলাম না?" মালেক বলিলেন, "এই যে দেখিতেছি অচ্ছেদ্য যুগল! বাস্তবিকই তোমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে তোমাকে অনুসন্ধান না করাটা ভুল হইয়াছিল। তোমাদের উভয়ের সঙ্গে তেহরাণ নিবাসী এই মির্জা-গীয়াসবেগকে পরিচিত করিয়া দিতেছি।"

রাজা বীরবল ও ফৈজি উভয়ে গীয়াসবেগকে অভিবাদন করিলেন এবং নূতন পরিচয়ে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

বীরবল মালেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন তুমি কি করিলে, বল। অনেক দিন ভবঘুরের মত ঘুরিয়া আসিয়াছ, এখন কিছুদিন শান্ত হইয়া বসিবে আশা করি!"

ফৈজি বলিলেন, "অসম্ভব! আমাদের মালেক কি কখন স্থির হইয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারে? গিরি-নদীর ন্যায় সে অবিরাম ছুটিবেই ছুটিবে।"

বীরবল বলিলেন, "আমারও একটু ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা হয়, আবার সেই পুরাতন শান্ত জীবন যাপন করি। কিন্তু চুম্বকের ন্যায় সম্রাট আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন, এখন আমি শক্তিহীন।"

ফৈজি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পুরাতন জীবন! এখনও সেই সকল কথা মনে পড়ে। আমার ভ্রাতা আবুল ফজল সেখ-উল-সদরের সঙ্গে এক দিন তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আমি গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছিলাম। আমার অপরাধ, আমি বলিয়াছিলাম, যে বিশ্বাসী ও কাফেরের তর্কযুদ্ধ আমার নিকট ভাল লাগে না, কারণ দেবমন্দিরে ও মসজিদে একই ঈশ্বর বিরাজ করেন।"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন, "তুমিওত প্রতিশোধ লইয়াছ! বৃদ্ধ বেচারী সেখ সদর এখন মক্কা যাত্রা করিয়াছেন।"

ফৈজি বলিলেন, "তা সত্য। তবে দাদার দার্শনিক যুক্তি অপেক্ষা তোমার ভাঁড়ামিতেই তাঁহার প্রাণ অধিক বিদ্ধ হইয়াছিল।"

মালেক বলিলেন, "এ কথা ঠিক। বীরবল যে তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহাই বৃদ্ধের হৃদয় ভেদ করিয়াছে। নিয়তির কি তীব্র উপহাস! সে দিন দেখিয়াছি, বৃদ্ধ সেখ সম্রাটের দেহে যষ্টি স্পর্শ করিয়াছেন, আর আজ কিনা তিনি মক্কার পথে!"

ফৈজি বলিলেন, "তাঁহার পক্ষে ইহা মঙ্গলেরই কারণ। এমন ঈশ্বরভক্তের পক্ষে ঈশ্বরের মন্দিরের নিকটে থাকাই বাঞ্ছনীয়!"

বীরবল হাসিয়া বলিলেন, "নাস্তিক! তোমাকে এই স্বধর্ম্মদ্রোহিতা ও অসংযত কল্পনাপ্রিয়তার ফল ভোগ করিতে হইবে।"

ফৈজি বলিলেন, "ওদের স্বধর্ম্মানুরাগ ওদের স্বর্গে লইয়া যাউক। শুণ্ডিকালয়ের দ্বারের রন্ধ্র দিয়া আমি স্বর্গের আলো দেখিতে পাই। লোকে যেখানে দেখে শুণ্ডিকালয়, আমি সেখানে দেখি দেবমন্দির।"

গীয়াসবেগ চমকিত হইয়া বলিলেন, "আপনি বলেন কি মহাশয়? আপনি অবশ্যই মদ্যপায়ী নহেন?"

ফৈজি বলিলেন, "বন্ধুবর, আমি মদ্যপাত্রে আমার প্রিয়তমের মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই, এজন্য আমি ঘোর মদ্যপায়ী। সম্রাট বিশ্বাসীদিগের জন্য স্বর্গীয় সুরা প্রস্তুত করিয়াছেন, অপেক্ষা করুন, আপনিও তাহা পান করিবেন।"

তখনই ভোজন গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সুতরাং

তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এখানেই স্থগিত হইল। ভোজন-গৃহে শ্বেতপ্রস্তরের সিংহাসনে সম্রাট উপবিষ্ট। সহস্র সুগন্ধি আলো ও পুষ্পস্তবকের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। একটী সুবৃহৎ বাতিদানের দুইটী বাহু দুইটী কুসুম সদৃশ, শত মোমবাতি পুষ্পদ্বয়ের কেশররূপে সজ্জিত, প্রত্যেক বাতি হইতে উজ্জ্বল আলো ও সুগন্ধি নির্গত হইতেছিল। আর একটী বাতিদানের মূলদণ্ড হইতে পাঁচটী পুষ্পিত শাখা নির্গত হইয়াছে, প্রত্যেক শাখায় ফল মুখে করিয়া এক একটী মনোহর পাখী। সেই সকল ফল হইতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো ও কস্তুরীর গন্ধ নির্গত হইতেছিল।

মস্তকোপরি মনোহর চিত্রশোভিত ছাদ। তাহা হইতে শত শত বহুমূল্য ঝাড় ঝুলিতেছিল। ঝাড়ের আলোক সমাগত অতিথিগণের মণিমুক্তাখচিত পোষাকে পতিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। দস্তরখাঁ (ভোজন টেবিলের উপরিস্থিত বস্ত্রাচ্ছাদন) বিবিধ প্রকার সুপক্ক খাদ্যে পরিপূর্ণ। সম্রাট নিজেও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করিয়া রহস্যালাপে যোগ দিলেন। সুসজ্জিতা সুন্দরী নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীতে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। এইরূপে প্রভাত পর্য্যন্ত আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল। উষাকালে বাহিরে প্রাভাতিক বাদ্য আরম্ভ হইলে উৎসব সমাপ্ত হইল।

মালেক মসুদ ও গীয়াসবেগ রথারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মালেক গীয়াসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অদ্যকার আনন্দ বেশ সম্ভোগ করিয়াছেন ত?"

গীয়াস বলিলেন, "আমার সকলই আপনার দয়ায়—আমার জীবন, আমার সম্মান, আমার বর্ত্তমান পদগৌরব—সকলই আপনার অনুগ্রহপ্রসাদাৎ। সম্রাট কি মহৎ, কি দয়ালু! তাঁহার কি অতুল বিভব!"

মালেক বলিলেন, "এক সময়ে চারি শত তুলাদণ্ড পাঁচ মাসকাল অবিরাম ওজন করিয়াও মণিমাণিক্য ও আসরফি ওজন করিয়া উঠিতে পারে নাই। তখন সাত কোটী আসরফি পরিমিত ধন কোষাগারে ছিল। ক্রমাগত তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্রাট আকবর দয়ালু প্রভু, অকৃত্রিম বন্ধু, পিতার ন্যায় ক্ষমাশীল; এই ঐশ্বর্য্যভোগের তিনি উপযুক্ত পাত্র। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।"

এমন সময়ে তাঁহাদের রথ গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহারা আরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। (ক্রমশঃ)

ম্যাট্‌সিনি।

(২)

যে দেশের রাজপুরুষগণ যুবকদিগের হাতে উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ দেখিলে ভীত হন, এবং সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তা ও মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ রোধ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে শত প্রকার অন্যায় অনুশাসনের শৃঙ্খলে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন; যে দেশে চিন্তাশীলতার জন্য সম্ভ্রান্তবংশীয় সুশিক্ষিত যুবককে কারাগারে ও নির্ব্বাসনে যাইতে হয়, সে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানিতে সকলেরই কৌতূহল হয়।

স্বার্থপর আটটি বিদেশী রাজশক্তি নির্ম্মম রাক্ষসের মত ইটালীকে করকবলস্থ করিয়া, পরাধীনতার সকল প্রকার বাঁধনে বাঁধিয়া, প্রাণপণে তাহার রক্ত শোষণ করিতে ছিল। এই প্রকার রাক্ষসী শাসন-প্রণালীর অধীনে থাকিয়া ইটালীবাসীগণ নিতান্ত নির্জ্জীব ও অসার হইয়া পড়িয়াছিল। অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করা, দাসত্বের ডালি মাথায় বহন করা, তাহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মানুষের সকল প্রকার স্বাধীন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াও যাহারা স্থির থাকিতে পারে, ভগবান বুঝি তাহাদের মস্তকে আরও নির্য্যাতন বর্ষণ করেন।

ইউরোপের সর্ব্বত্র জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস যতই প্রবল হইতে লাগিল, ইটালীর রাজশক্তিসমূহ ততই বিদ্রোহের ভয়ে ভীত হইয়া ইটালিবাসীদিগকে সকল প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে লাগিল। ছোট ছোট আটটি রাজ্য; প্রজাদিগের কোনও বিষয়ে একটুও স্বাধীনতা ছিল না। এক অংশ হইতে অপর অংশে যাইতে হইলেও গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হইত। এক খানা পুস্তক নিজের ইচ্ছা মত কিনিয়া পড়িবার অধিকার ছিল না। জেনোয়াতে

যে পুস্তক মুদ্রিত হইত ফ্লোরেন্সের লোক সে পুস্তক পাঠ করিতে পারিত না।

একটী জাতিকে যত প্রকারে ছিন্নভিন্ন করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহাদের রক্ত শোষণ করিবার সুবিধা ততই বেশী। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রত্যেক রাজ্যের সীমান্তে রাক্ষসের মত শুল্কালয় (Custom House) বর্ত্তমান ছিল—তাহাদিগের গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়া এক রাজ্যের লোকের পক্ষে অপর অপর অংশে গিয়া বাণিজ্য করা নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার ছিল। এক প্রদেশের কর্ম্মচারীগণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অন্য প্রদেশে গিয়া কাজ করিতে পারিত না। ব্যবস্থাপক সভা, কর নির্দ্ধারণ, শাসন, প্রকাশ্য সভা ও বক্তৃতা প্রভৃতি কোনও বিষয়ে কোনও অধিকার তাহাদের ছিল না। পুলিশের হাতে অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। সর্ব্বত্র পুলিশের গুপ্তচর সংবাদ সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিত। অতি সামান্য কারণে, কোন্ গৃহকোণে কে একটা কি কথা বলিয়াছে, অথবা কোন্ স্কুলে কোন্ বালক তাহার সঙ্গীকে কি বলিয়াছে, এইরূপ ব্যাপার লইয়া পুলিশ যে কোনও ব্যক্তির গৃহ ও সম্মানের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিত এবং করিত।

দেশের উপর দিয়া যখন অবাধে এই প্রকার অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছিল, তখন "কারবোনারী" সম্প্রদায় ইহার প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হয়। যখন ম্যাট্‌সিনি কারাগারে ছিলেন, সেই সময়ে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে তাহারা সর্ব্বশেষ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করে। অতি অল্প দিনের মধ্যে চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়া গেল। মধ্য ইটালীর অনেক প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। কিন্তু প্রবল অষ্ট্রীয় রাজশক্তি মার্চ্চ মাসের মধ্যেই সব আগুন নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল।

কেন এরূপ হইল? নেতৃবৃন্দ যথেষ্ট চিন্তাশীলতা, দূরদৃষ্টি এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। সকলেই স্বার্থত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু ও স্বদেশবৎসল ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দুই বিষয়ে নিতান্ত ভ্রান্ত ছিলেন। ১ম, তাঁহাদের সামরিক শক্তি যে কতটা, তাহা তাঁহারা তলাইয়া দেখেন নাই, এবং চিন্তাই করেন নাই যে তাঁহাদের স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় অষ্ট্রীয়া চুপ করিয়া থাকিবে না, অষ্ট্রীয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য। ২য়, তাঁহারা জনসাধারণকে বাদ দিয়াই দেশের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভয় করিতেন, যে অজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহাদের কাজে অযথা গোলযোগ উৎপন্ন করিবে। যে দেশের জনসাধারণ দেশের কাজে না দাঁড়ায়, সে দেশ কখনও দাঁড়াইতে পারে না। তাই কারবোনারীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

ম্যাট্‌সিনি লায়ন্‌স্ (Lyons) হইতে সাহায্যের জন্য দুই হাজার লোক পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, যে সকল চেষ্টা পণ্ড হইয়া গিয়াছে। ম্যাট্‌সিনি ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি কারবোনারী সম্প্রদায়ের দ্বারা ইটালীর উদ্ধার হইবে না? অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন,—নূতন প্রণালীতে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়া দেশের কার্য্যে ব্রতী করিতে হইবে। যুবকদিগকেই এই কার্য্যে নেতৃত্ব করিতে হইবে। বর্ষীয়ান্‌দিগের সম্বন্ধে তিনি এতই নিরাশ হইয়াছিলেন, যে তিনি নিয়ম করিলেন, তাঁহার দলে ৪০ বৎসরের অধিক বয়স্ক কেহ সভ্য হইতে পারিবে না। এক দিকে যেরূপ নৈরাশ্য, অপর দিকে তাঁহার নিজের এবং সমসাময়িক যুবকদিগের উপর তাঁহার অসীম এবং সুদৃঢ় আশা ও বিশ্বাস ছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, যে তাঁহাদের দ্বারা ইটালীর উদ্ধার হইবেই হইবে। এই বিশ্বাসের মূলে সুগভীর চিন্তা এবং সুদৃঢ় ঈশ্বরবিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল।

ঈশ্বর মানুষমাত্রেরই জীবনে কোনও না কোন উদ্দেশ্য রাখিয়াছেন; তেমনি এই বিশ্বের উন্নতিসাধন ব্যাপারে, প্রত্যেক জাতির উপর কোনও না কোনও বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের ভার দিয়াছেন। ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি এক মহা জাতিতে পরিণত হইবে—ম্যাট্‌সিনি যেন ইহা প্রত্যক্ষ করিতেন। মানবজাতির এই মহান্ বিকাশ, উন্নতি ও একতাভিমুখী মহা যাত্রায় বিভিন্ন দেশবাসী প্রত্যেক জাতির (nation) বিধাতানির্দ্দিষ্ট কিছু কর্ত্তব্য আছে, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তির

কিছু কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য পালনে পরাধীনতা মহা অন্তরায়। মানবজাতির শত্রু এবং ইটালীর শত্রু প্রজারক্তশোষণকারী অত্যাচারী রাজশক্তিকে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে ইটালীবাসীগণ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না; অতএব এই রাজশক্তিকে বিনাশ করিয়া ইটালীকে স্বাধীন করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া ম্যাট্‌সিনি "নব ইটালী" নামক সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেন। গোপনে সভার কায চলিতে লাগিল। দেশত্যাগী কয়েকজন স্বদেশবৎসল যুবক সর্ব্ব প্রথম এই সভায় যোগদান করেন। এই সভার উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা, নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে ম্যাট্‌সিনির মনস্বিতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

তাঁহার এই মহৎ রাজনৈতিক প্রয়াসের মূলে, সুগভীর ও সুদৃঢ় বিশ্বজনীন ধর্ম্মবিশ্বাস বর্ত্তমান দেখা যায়। যে কোনও নীতি, নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা মানবাত্মা অনন্ত উন্নতির অভিমুখে, সত্য, প্রেম, পবিত্রতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারে, তাহাকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ধর্ম্ম উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, বিবেকের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরায়ণতার ধর্ম্ম, মঙ্গল অনুষ্ঠান ও স্বার্থত্যাগের ধর্ম্ম, সত্যাসত্যের সংগ্রামের ধর্ম্ম।

তাঁহার গভীর ধর্ম্মানুভূতি হইতেই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতারূপে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মভাবকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি সুন্দর, সুগঠিত ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। সেই দুর্গ "নব ইটালী" সমিতি—ইটালীর উদ্ধারসাধন জন্য ইটালীর যুবকবৃন্দের সাধনক্ষেত্র ও সাধক মণ্ডলী (Brother-hood)।

এই মণ্ডলীর একটী পূর্ণ আদর্শ ম্যাট্‌সিনি তাঁহার মনের মধ্যে গড়িয়া রাখিয়াছিলেন। স্বার্থমূলক, কুটিলনীতিপূর্ণ রাজনীতি কোনও মানুষ বা জাতিকে মহৎ করিতে পারে না। অপর পক্ষে ধর্ম্মবিশ্বাস, পবিত্র নীতি, কর্ত্তব্যবোধ, ঈশ্বরের গৌরব, ও মনুষ্যত্বের মহত্বজ্ঞান, এবং এই সকলের প্রেরণায় স্বার্থত্যাগ মানুষকে ও জাতিকে মহৎ করিতে পারে, গৌরবান্বিত করিতে পারে। কোনও মণ্ডলী যদি কোনও দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চায় তবে সেই মণ্ডলীকে এই সকল মহৎ ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে। স্বার্থপ্রণোদিত ক্ষণিক স্বার্থত্যাগের আয়োজনের অপঘাত-মৃত্যু অনিবার্য্য। কারবোনারী সম্প্রদায় কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখিয়াছিল। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি ভগবানের গৌরব ও মনুষ্যত্বের মহত্বজ্ঞান প্রভৃতি উন্নত ও পবিত্র ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইটালীর উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

"God and the People"—ভগবান এবং জনসাধারণ;—ঈশ্বরের নিকট হইতে অনুপ্রাণন, আশা, এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান লাভ করিয়া—তদ্দ্বারা জন সাধারণের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করা, সর্ব্বসাধারণকে ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাধীনতার লুপ্ত অধিকার পুনঃ প্রদান করিয়া সমস্ত জাতিকে গৌরবান্বিত করা, নব ইটালীর সাধনমন্ত্র হইল।

ইটালীর বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে এক সজীব অনুভূতিময় একতাপাশে বদ্ধ করিয়া, সমস্ত দেশব্যাপী এক প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করা—হইল ইহার উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইটালীর যুবকদিগকে মহৎ ভাবের অনুপ্রাণনে সঞ্জীবিত করিতে হইবে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা উদ্বোধিত করিতে হইবে, এবং তাহাদিগের দ্বারা জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে, তাহাদিগকে জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে, এই ভাব অন্তরে লইয়া তিনি সমস্ত দেশকে জাতীয় মহা উত্থানের সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিবার জন্য মণ্ডলী গঠন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির অনেক লোক লইলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সংখ্যাতে কিছু আসে যায় না। এক বিশ্বাস, এক উদ্দেশ্য, এক ভাব হওয়া চাই,—ইহাতেই শক্তি। "নব ইটালীর" জন্য তিনি যে সকল নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন, সম্পূর্ণ রূপে সে সকল নিয়মের অধীন না হইয়া কেহই তাহার সভ্য হইতে পারিত না। এইরূপ দৃঢ়তা এবং বাঁধাবাঁধির মূলে গভীর অন্তর্নিহিত একতার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল।

(ক্রমশঃ)

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত। ৬৪



বদরুদ্দীন তায়েবজী।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

২য় ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩১৩। | ৩য় সংখ্যা।

ঋগ্‌বেদের দেবতাগণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, অতি প্রাচীন কালে আর্য্য ঋষিদের মতে বরুণ সমস্ত জগতের ঈশ্বর ছিলেন। স্বর্গ এবং পৃথিবী তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি বিশ্বের সর্ব্বজ্ঞ শাসনকর্ত্তা। কিন্তু কালক্রমে সেই বিশ্বাস লোপ পাইল এবং ইন্দ্র বৈদিক দেবতাদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উন্নীত হইলেন। বেদানুসারে ইন্দ্র অন্তরিক্ষ অথবা বায়ুমণ্ডলের দেবতাদের নেতা; তিনি যুদ্ধবলে বৃত্রকে জয় করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা মানব জাতির অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট অনেক প্রার্থনা হইত। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে বিশ্বস্রষ্টা এবং ত্রাণকর্ত্তা বরুণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। কিন্তু পৌরাণিক মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি ইন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তিনি পূর্ব্বদিকপাল এবং দ্বাদশ আদিত্যের একজন মাত্র। ঋগ্‌বেদ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রাচীন ঋষিগণ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রধান দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ঋগ্‌বেদের এক চতুর্থাংশেরও অধিক ইন্দ্রের স্তুতিতে পরিপূর্ণ।

গ্রীক ভূগোলবেত্তা ষ্ট্রাবো (Strabo) বলিয়াছেন, যে প্রাচীন ভারতের লোকেরা বৃষ্টিপ্রদ জুপিটার, গঙ্গা এবং ভারতীয় দেবতাদের উপাসনা করিতেন। বৃষ্টিপ্রদ জুপিটার যে ইন্দ্র তৎসম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

দ্যৌঃ শব্দের মৌলিক প্রাকৃতিক অর্থ এত সহজে বোধগম্য, যে তাহা কখনও পৌরাণিক গল্পে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু বরুণের নৈতিক চরিত্র গূঢ় আত্মিক ভাবাপন্ন, সুতরাং তাহা দীর্ঘকাল লোকস্মৃতির বিষয়ীভূত থাকিতে পারিল না। বৈদিক কবিগণ ভারতের সুরম্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রের চরিত্র এবং কার্য্যকলাপ চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সুতরাং একথা বলা যাইতে পারে, যে ইন্দ্রের অভ্যুদয় বৈদিককালীন আর্য্যদের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে অবনতির কালজ্ঞাপক। তাঁহার গুণসমূহ প্রধানতঃ শারীরিক প্রাধান্যসূচক এবং অনেকাংশে আত্মিক ভাব বিহীন।*

এখন দেখা যাক, ইন্দ্রের জন্ম সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে কি

* (See Philips, The teaching of the Vedas, p. 45)

আছে। কারণ যদিও ইন্দ্রের মহত্ত্ব এবং বিপুল শক্তির অনেক প্রশংসা পাওয়া যায় তথাপি তিনি দেহধারী এবং তাঁহার পিতামাতার উল্লেখ আছে। তৃতীয় অষ্টকে ৪৮ সূক্তের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঋকে ইন্দ্রের নিম্নলিখিত জন্ম-বৃত্তান্ত আছে :—

যজ্জায়থাস্তদহরস্য কামেংহশোঃ পীযূষমপিবো গিরিষ্ঠাং।
তং তে মাতা পরি যোষা জনিত্রী মহঃ পিতুর্দম আসিংচদগ্রে॥
উপস্থায় মাতরমন্নমৈট্ট তিগ্মমপশ্যদভি সোমমূধঃ।

তোমার জন্মদিনেই সোমপিপাসু হইয়া তুমি গিরিজাত সোমলতার অভিনব রস পান করিয়াছিলে। তোমার যুবতী জননী অদিতি তোমার পরাক্রান্ত পিতা কশ্যপের গৃহে স্তন্য দানের পূর্ব্বে সেই সোমরস পান করাইয়া ছিলেন। মাতার নিকট গিয়া ইন্দ্র আহার চাহিলেন; তাঁহার স্তনে ক্ষীররূপে স্থিত দীপ্ত সোম দেখিতে পাইলেন।

চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদ্রশ সূক্তে ইন্দ্রের জন্মের কথা এইরূপ আছে :—

অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো মা মাতরমমুয়া পত্তবে কঃ॥১
অবদ্যমিব মন্যমানা গুহাকরিন্দ্রং মাতা বীর্য্যেনা ন্যৃষ্টং।
অথোদস্থাৎ স্বয়মৎকং বসান আ রোদসী অপৃণাজ্জায়মানঃ॥৫
সৃষ্টিঃ সস্থব স্থবিরং তবাগমনাধৃষ্যং বৃষভং তুত্রমিন্দ্রং।
অরীল্হং বৎসং চরথায় মাতা স্বয়ং গাতুং তন্ব ইচ্ছমানং।১০
উত মাতা মহিষমন্ববেনদমী ত্বা জহতি পুত্র দেবাঃ।
অথাব্রবীদ্‌বৃত্রমিন্দ্রো হনিষ্যন্‌ৎসখে বিষ্ণো বিতরং বি ক্রমস্ব॥১১
কস্তে মাতরং বিধবামচক্রচ্ছয়ুং কস্ত্বামজিঘাংসচ্চরন্তং।
কস্তে দেবো অধি মার্ডীক আসীদযৎ প্রাক্ষিণাঃ পিতরং পাদগৃহ্য॥১২

এই প্রাচীন পথে জায়মান সকলেই চলিয়াছে; এই পথে সমস্ত দেবতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই মার্গ দ্বারা প্রবৃদ্ধ (বাম দেব) জন্মগ্রহণ করুন; তাঁহার মাতার বিনাশের চেষ্টা যেন না করেন।

ইন্দ্রের জন্ম নিন্দনীয় মনে করিয়া শক্তিশালী ইন্দ্রকে তাঁহার মাতা লুকাইয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র বেশপরিহিত হইয়া উত্থিত হইলেন এবং জন্মমাত্র স্বর্গ এবং পৃথিবী পূর্ণ করিলেন। গাভী যেমন বৎস প্রসব করে, তদ্রূপ ইন্দ্রের মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, যেন অন্যনিরপেক্ষ গমন ইচ্ছা করিয়া তিনি স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। ইন্দ্র স্থবির, প্রবৃদ্ধবল, শত্রুর অজেয়, প্রবল, পরাক্রান্ত এবং শত্রু দ্বারা অনভিভূত।

"হে বৎস ইন্দ্র! ঐ দেবতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন", এই বলিয়া তাঁহার মাতা পরাক্রান্ত পুত্রকে নিরীক্ষণ করিলেন। অনন্তর বৃত্র বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইন্দ্র বলিলেন, 'হে সখে বিষ্ণো, অতিপরাক্রান্ত হও এবং অগ্রসর হও।'

কে তোমার মাকে বিধবা করিয়াছিল? শয়ান অথবা জাগ্রত অবস্থায় কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল? তুমি যখন পায়ে ধরিয়া তোমার পিতাকে বধ করিয়াছিলে তখন কে তোমার সাহায্য করিয়াছিল?

অথর্ববেদ (৩।১০।১২) অনুসারে একাষ্টকা কঠোর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন :—

একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভম্মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা অসহন্ত শত্রূন্ হন্তা দস্যূনামভবৎ শচীপতিঃ॥

কঠোর তপস্যা করিয়া একাষ্টকা প্রতাপান্বিত ইন্দ্রকে সন্তানরূপে পাইয়াছিলেন। তাঁহাদ্বারা দেবতারা তাঁহাদের শত্রু জয় করিলেন; শচীপতি অর্থাৎ শক্তিপতি দস্যুহন্তা হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (১০।৯০।১৩) লিখিত আছে, যে ইন্দ্র এবং অগ্নি পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন হইলেন। অতএব ইন্দ্র এবং অগ্নি যমজ ভ্রাতা।

অন্যত্র (৯।৯৬।৫) এক ঋষি বলেন যে ইন্দ্র সোমের পুত্র—

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ।
জনিতাগ্নের্জনিতা সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ॥

একথা বলা উচিত, যে সায়নের মতে এই স্থলে জনিতা শব্দের অর্থ "মদস্য জনয়িতা।" সোমপানে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা আপ্যায়িত হইয়া থাকেন।

ইন্দ্রের স্ত্রী শচী ভারতীয় পুরাণে সুপরিচিত। ঋগ্‌বেদেও তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। শচী শব্দ বাক্য, বাগ্মিতা, শক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি নানা অর্থে বেদে

ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্রকে কোন কোন স্থলে শচীপতি এবং শচীবান্ বলা হইয়াছে। অতি প্রথমে ইন্দ্র শক্তিশালী এবং প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন বলিয়া যে তাঁহাকে এইরূপ নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে এই শচী অথবা শক্তিতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হইল এবং প্রজ্ঞাবাচী শচী শব্দ ইন্দ্রের স্ত্রীরূপে পরিণত হইল।

যুক্তস্তে অস্ত দক্ষিণ উত সব্য শতক্রতো।
তেন জায়ামুপ প্রিয়াং মন্দানো যাহ্যন্ধ সো যোজাখিন্দ্র-
তেহরী॥ ১।৮২।৫।

হে বহুকর্ম্মবন্নিন্দ্র, তোমার রথে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্ব যুক্ত হউক, বামপার্শ্বস্থ অশ্বও যুক্ত হউক। সোমপান করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া প্রীণয়িত্রী জায়ার কাছে যাও। তজ্জন্য তোমার অশ্বদ্বয় সত্বর রথে যোজিত কর।

৯ম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের দ্বাদশ ঋকে আরো কয়েক জন দেবতার স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ইহেন্দ্রাণীমুপহ্বয়ে বরুণানীং স্বস্তয়ে।
অগ্নায়ীং সোমপীতয়ে॥

আমাদের কল্যাণার্থ এবং সোমপানের জন্য ইন্দ্রাণী, বরুণানী এবং অগ্নায়ীকে এই এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি। দশম মণ্ডলে ইন্দ্রানীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

ইন্দ্রাণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবং।
নহ্যস্যা অপরং চন জরসা মরতে পতিবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ॥
১০।৮৬।১১।

আমি শুনিয়াছি, যে এই সকল রমণীর মধ্যে ইন্দ্রাণী সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী। কারণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র তাঁহার পতি, যিনি কখনও বার্দ্ধক্য হেতু মরিবেন না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের প্রাসহা নাম্নী এক স্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরাণে ইন্দ্র সম্বন্ধে অশ্লীল গল্প পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদে যদিও বহু সংখ্যক সূক্তে ইন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি বৈদিক সাহিত্যেই তাঁহার সম্বন্ধে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ অনেক কথা পাওয়া যায়ঃ—

প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়া পক্ষপাতীগণ যাহা হয়ত নিন্দনীয় মনে করিবেন না এই রকম একটী পদ উদ্ধৃত করিবঃ—

অদদা অর্ভাং মহতে বচস্যায় কক্ষীবতে বৃচয়ামিন্দ্র সুন্বতে।
মেনাভবো বৃষণস্য সুক্রতো বিশ্বেত্তা তে সবনেষু প্রবাচ্যা॥
১।৫১।১৩।

হে ইন্দ্র, তুমি তোমার স্তবাভিলাষী এবং তোমার যজ্ঞে সোমাভিষবকারী কক্ষীবান্ মহারাজকে নবযৌবনা বৃচয়া নাম্নী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলে। হে শোভনকর্ম্মকারী ইন্দ্র, তুমি বৃষণশ্ব রাজার মেনা নাম্নী ভার্য্যা হইয়াছিলে; অতএব তোমার উক্ত কার্য্য সকল যজ্ঞেতে প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করা উচিত।

কাঠকে এইরূপ লিখিত আছে, যে ইন্দ্র বিলিস্তেঙ্গা নাম্নী এক দানবী দ্বারা মুগ্ধ হইয়া অসুরদের মধ্যে থাকিতেন। দানবী স্ত্রীলোকদের মধ্যে থাকিবার সময়ে তিনি দানবীর বেশে থাকিতেন এবং দানবদের মধ্যে দানবের বেশে থাকিতেন। অবশেষে নির্ঋতি নামক রাক্ষস জাতীয় এক পাপদেবতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে আহুতি দ্বারা রক্ষা পাইতে চেষ্টা করিলেন।

অথর্ববেদে এক স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে এইরূপ বলিতেছেঃ—তোমার ভালবাসা আকর্ষণ করিবার জন্য আমি এই উপায়ে তোমাকে বশীভূত করিতে চাই, যদ্দ্বারা আসুরী ইন্দ্রকে দেবতাদের মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়াছিল।

পৌরাণিক কবিগণ ইন্দ্রের এই gallantry বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্দ্রাণী যদিও তাঁহার প্রিয়া পত্নী ছিলেন, তথাপি অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি অনেক সময় তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই, যে তিনি দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আসিয়াছিলেন। নারদ ইন্দ্রের কাছে দময়ন্তীর সৌন্দর্য্য এবং স্বয়ম্বরের কথা বলিলেনঃ—

বিদর্ভরাজ্ঞো দুহিতা দময়ন্তীতি বিশ্রুতা।
রূপেণ সমতিক্রান্তা পৃথিব্যাং সর্ব্বযোষিতঃ॥২১॥
তস্যাঃ স্বয়ম্বরঃ শক্র ভবিতা ন চিরাদিব।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ॥২২॥
তাং রত্নভূতাং লোকস্য প্রার্থয়ন্তো মহীক্ষিতঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি স্ম বিশেষেণ বলবৃত্রনিসূদন॥২৩॥

বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী নাম্নী কন্যা অলোক-

সামান্য রূপলাবণ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত রমণীবৃন্দকে অতিক্রম করিয়াছে। আজি শুনিলাম, তাহার স্বয়ম্বর অতি শীঘ্রই সম্পন্ন হইবে; এই নিমিত্ত রাজা ও রাজকুমারেরা কায়মনোবাক্যে সেই লোকললামভূতা কন্যারত্ন কামনা করতঃ দিগ্ দিগন্ত হইতে তথায় গমন করিতেছেন।

ততস্তে শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে নারদস্য বচো মহৎ।
শ্রুত্বৈব চাব্রুবন্ হৃষ্টা গচ্ছামো বয়মপ্যুত ॥২৫॥
ততঃ সর্ব্বে মহারাজ সগণাঃ সহবাহনাঃ।
বিদর্ভানভিজগ্মুস্তে যতঃ সর্ব্বে মহীক্ষিতঃ ॥২৬॥

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে লোকপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদমুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে দেবর্ষে! আমরাও দময়ন্তী স্বয়ম্বরে গমন করিব। অনন্তর তাঁহারাও স্বগণ ও স্ব স্ব বাহন সমভিব্যাহারে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বলা বাহুল্য, যে ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ কেবল তামাসা দেখিবার জন্য দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আসেন নাই। কিন্তু দময়ন্তী কর্তৃক বৃত হইবার আশায়ই আসিয়াছিলেন। পথে নলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে ইন্দ্র নলকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য বলিলেন ঃ—

অহমিন্দ্রোঽয়মগ্নিশ্চ তথৈবায়মপাম্পতিঃ।
শরীরান্তকরো নৃণাম্ যমোঽয়মপি পার্থিব ॥৪॥
ত্বং বৈ সমাগতানস্মান্ দময়ন্ত্যৈ নিবেদয়।
লোকপালা মহেন্দ্রাদ্যাঃ সভাং যান্তি দিদৃক্ষবঃ ॥৫॥
প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি দেবাস্ত্বাং শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ।
তেষামন্যতমং দেবং পতিত্বে বরয়স্ব হ ॥৬॥
বনপর্ব্ব, ৫৫।৪-৬॥

নল কর্তৃক অভিহিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, আমরা দেবতা; দময়ন্তীর নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছি। আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি; উনি জলেশ্বর বরুণ, আর ইনি মনুষ্যের জীবনান্তকারী অন্তক, এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিবে, যে "মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ ত্বদীয় করগ্রহণাভিলাষে সভায় আগমন করিতেছেন, তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর।"

ইন্দ্রের শারীরিক এবং মানসিক গুণ বর্ণনার্থ অনেক বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তিনি উদ্গূর্ণবল (উগ্র), নর্য্য (নরের হিতকারী), শতক্রতু (শত যজ্ঞকারী) ধৃষ্ণু (শত্রুজয়কারী) বজ্রী, দক্ষিণাবান্ (স্তোতৃদত্ত ধনশালী) প্রশস্তরূপবিশিষ্ট, নৃত (রণে নর্ত্তনশীল) প্রবৃদ্ধ, ত্বরান্বিত, গুণদ্বারা মহান্, ঋচীষম (স্তুতির উপযুক্তপাত্র) অনিবার্য্যগতি, প্রসিদ্ধ, উপমেয়, অতি মহৎ ধনদাতা, মেধাবী, বীর, অসুরদিগের পুরবিদারক, প্রশংসনীয়ান্নবিশিষ্ট, বলবান্, বজ্রক্ষেপক, জগদ্ব্যাপক এবং শত্রুদিগের পরাভবকর্ত্তা। অনেক স্থলে তাঁহাকে সুশিপ্র বলা হইয়াছে। সায়নাচার্য্যের মতে সুশিপ্র শব্দের অর্থ শোভনহনু অথবা শোভননাসিক। মিল্টনের স্বর্গভ্রষ্ট angel গণ যেমন ইচ্ছানুসারে পুরুষ, স্ত্রী অথবা অন্য যে কোন আকার ধারণ করিতে পারে তদ্রূপ ইন্দ্রও করিতে পারেন; তাঁহার অনন্ত আকার—

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।৬।৪৭।১৮

সায়নের মতে ইহার অর্থ এই ঃ—ইন্দ্র আত্মজ্ঞান দ্বারা বহুবিধশরীর হইয়া অনেক যজমানের নিকট গিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্ত পরিভাষালেখক ধর্ম্মরাজ ধ্বরীন্দ্র বলেন, যে এস্থলে ইন্দ্রশব্দের অর্থ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্য পরমাত্মা, মায়াশব্দের অর্থ অজ্ঞান। মায়াগত সত্ত্বরজতমো গুণ দ্বারা এক পরমাত্মা জগদ্রূপ বিচিত্র কার্য্যরূপে অবভাসিত হন।

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাং।
৩।৫৩।৮

মঘবান্ যে যে রূপ ইচ্ছা করেন পুনঃ পুনঃ সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হন। তিনি স্বদেহ ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত করিতে পারেন।

ইন্দ্র হস্তে হিরণ্ময় কশা ধারণ করেন এবং হিরণ্ময় রথে গমনাগমন করেন। তাঁহার রথ মন অপেক্ষাও দ্রুতগতি ঃ—

যস্তে রথো মনসো জবীয়ানেন্দ্র তেন সোমপেয়ায় যাহি।
তূয়মা তে হরয়ঃ প্রদ্রবন্তু যেভির্যাসি বৃষভির্ম্মন্দমানঃ ॥
১০।১১২।২

হে ইন্দ্র! মন অপেক্ষাও যে দ্রুতগতি তোমার রথ তাহাতে আরোহণ করিয়া আমাদের সোমপানার্থ আইস।

যে অশ্বগণের দ্বারা হৃষ্ট চিত্তে তুমি গমন কর তাহারা শীঘ্র তোমাকে আনয়ন করুক।

সাধারণতঃ ইন্দ্রের দুই অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু অনেক স্থলে চারি, ছয়, দশ এবং ততোধিক অশ্ব ইন্দ্রের রথবাহকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

দানায় মনঃ সোমপাবন্নস্ত তেঽর্ব্বাঞ্চা হরী বন্দন শ্রুদা কৃধি।
যমিষ্ঠাসঃ সারথয়ো য ইন্দ্র তে ন ত্বা কেতা আদভ্নুবন্তি
ভূর্ণয়ঃ॥ ১৫৫।৭

হে সোমপায়ী ইন্দ্র, তোমার মন দানে রত হউক, স্তুতি শ্রবণকারী তোমার অশ্বদ্বয়কে আমাদের যজ্ঞাভিমুখী কর। হে ইন্দ্র, তোমার যে সকল সারথি তাহারা অতিশয় অশ্বনিয়মনকুশল; এই হেতু প্রতিকূল শত্রু সকল ভীত হইয়া তোমাকে হিংসা করে না। ইন্দ্রের সারথি মাতলি পুরাণে অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঋগ্বেদে কেবল একস্থানে তাহার উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হয়। দশম মণ্ডলের চতুর্দ্দশ স্থক্তে মাতলী নামক এক দেবতার উল্লেখ আছে। সায়নের মতে তথায় মাতলী শব্দের অর্থ এই ঃ—

"মাতলিরিন্দ্রস্য সারথিঃ। তদ্বানিন্দ্রো মাতলী।"

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের হস্তী ঐরাবতের কোন উল্লেখ নাই।

শ্রীরাজকুমারী দাস।

ব্রতধারণ।

(বঙ্গদর্শনে উক্ত শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে)

তুলি' উর্দ্ধে নত প্রাণ আশার কিরণে
উঠিলে যে দিন জাগি, মাতৃ আবাহনে
রজনীর তন্দ্রা হ'তে, ফিরিলে যে দিন
জননীর পুণ্য গৃহে ক্ষীণ অতি ক্ষীণ
উষার মলিনালোকে, দেশের বসনে,
দেশের ভূষণে সাজি, মায়ের চরণে
যে দিন নমিলে সবে, জগৎ সম্মুখে
গ্রহণ করিলে ব্রত—প্রাণ ভরা দুখে—
প্রভাত অরুণালোকে, জননীর মাটি
জননীর যাহা কিছু স্বর্ণ অতি খাঁটি,
যে দিন মানিতে হ'ল, দিলেন সে দিন
ঢালি' তোমাদের শিরে—অতি দীন হীন—
জননী আশিষ-বারি। দেখো বোন্ দেখো
সে ব্রত ভাঙ্গে না যেন, আমরণ রেখো।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

বম্বের কথা।

বম্বে ভারতের একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। তদ্ভিন্ন ইহা একটী বৃহৎ বন্দর ও বাণিজ্যস্থান। অনেকে বলেন, যে বম্বে মহানগরী কলিকাতা অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা সহর City of palaces অর্থাৎ প্রাসাদময়ী নগরী নামে গৌরবান্বিত ছিল। কিন্তু ইদানীং বম্বের শিল্পোন্নতিতে কলিকাতার সে গৌরব আর নাই। বম্বের বাড়ীগুলি কলিকাতার বাড়ী অপেক্ষা অনেক সুন্দর। দেখিতে এক একখানি ছবির মত। অধিকাংশ বাড়ী পাঁচ ছয় তলা পর্য্যন্ত উচ্চ।

বম্বের পূর্ব্বনাম বম্বেম্ বা মুম্বই। প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্যক্রোড়ে বম্বের জন্ম ও বৃদ্ধি। একাধারে সমুদ্র, নির্ঝরিণী, হ্রদ, দ্বীপ, পর্ব্বত ও গুহাদির এরূপ সম্মিলন অন্যত্র অতি বিরল। বম্বে সহরটাই কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি।

পূর্ব্বকালে বম্বে একটী অস্বাস্থ্যকর সামান্য স্থান ছিল। ইংরাজেরা রাজত্বের প্রারম্ভে শাসনের সুবিধার জন্য সুরাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বম্বাইয়ে রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি বম্বের উন্নতির প্রারম্ভ।

বম্বে একটী বিচিত্র স্থান। বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন পরিচ্ছদের এরূপ সমাবেশ অন্য কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ। অধিবাসীগণের মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাটী, মারওয়ারী, নেটিভ পর্ত্তুগীজ (Indo-Portugueese) মুসলমান ও পারশীগণের সংখ্যাই অধিক। তদ্ভিন্ন ইহুদী, জাপানিজ, চাইনিজ, ইউরোপীয়ান, মলয়াস্, মান্দ্রাজী ও অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ও অন্যান্য জাতিও আছে। এই সকল জাতির মধ্যে পারশীগণ

সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই পারশীগণ ভারতবর্ষীয় কোনও জাতির অন্তর্গত নয়। ইহারা পূর্ব্বে পারস্য দেশের অধিবাসী ছিল।

পারস্য দেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলে ইহারা আপনাদের ধর্ম্ম "অগ্নি-উপাসনা" পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়া পারস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে আগমন করে। তৎপর ইহারা ইউরোপীয়দিগের সহিত নানারূপ কার্য্য করিয়া বিশেষতঃ জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে কুশলতা হেতু শীঘ্রই উন্নতি লাভ করে। আপনাদের পরিশ্রম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বর্ত্তমান সময়ে ইহারা ভারতের একটী উন্নত, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধিশালী জাতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পারশী মহিলাগণ পূর্ব্বে পাজামা ও জামা মাত্র ব্যবহার করিতেন, পরে গুজরাটী মহিলাদিগের নিকট হইতে শাড়ী পরিধান করিতে শিক্ষা করেন। এবং ক্রমশঃ ইউরোপীয় মহিলাদিগের বেশভূষারও কতকটা অনুকরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের বর্ত্তমান বেশ অতি সুন্দর ও সুসঙ্গত। ইঁহারা সুতার শাড়ী কথনও ব্যবহার করেন না, বার তের হাত রেশমী বস্ত্র পরিধান করেন। অনেক পারশী মহিলা গৃহে শাড়ী পরিধান করেন না। কেবলমাত্র বহির্গমনকালে বস্ত্র পরিধান করেন। পুরুষগণ গৃহে সাদা সুতার পাজামা ও জামা ব্যবহার করেন। বাহিরে যাইবার সময় সাদা প্যাণ্ট ও কাল অথবা অন্য কোনও রঙের কোট ব্যবহার করেন। তবে আজ কাল অনেকে পূর্ণমাত্রায় ইংরাজী পোষাক পরিয়া থাকেন।

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সর্ব্বদা বাড়ীতে জুতা ব্যবহার করেন। ধর্ম্ম নিয়মানুসারে পুরুষ বা স্ত্রীলোক মস্তক কথনও খুলিয়া রাখেন না। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা মাথায় এক খানি সাদা রুমাল বাঁধিয়া রাখেন এবং পুরুষেরা সর্ব্বদা একটী ছোট মখমলের টুপী মাথায় দিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন কোট বা কাপড়ের নীচে কোমরে সর্ব্বদা পইতা জড়াইয়া রাখাও ধর্ম্মনিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু তাহারা কোমরে যে পইতা জড়ায় তাহা জাতিভেদের চিহ্নস্বরূপ নহে। ইহারা জাতিভেদ মানে না।

ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা অথবা বাল্যবিবাহ নাই, বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এক স্ত্রীর বর্ত্তমানে পুনর্ব্বিবাহ চলে না। তবে কোন কোন পারশী স্ত্রীর বর্ত্তমানে শ্যালিকাকেও বিবাহ করিয়াছেন এরূপ দেখা যায়। পারশী রমণীগণ পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন। বর্ত্তমান ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শহেতু পারশী রমণীগণ অতিশয় বেশভূষাপ্রিয়; এবং তৎপ্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পারশী রমণীগণ দেখিতে অতি সুন্দরী। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই বর্ণ ইউরোপীয়ানদিগের ন্যায় উজ্জ্বল, তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ প্রায় সকলেরই বর্ণ অতি উজ্জ্বল। বিবাহ-বাসরে মণিমুক্তায় সুসজ্জিতা, নানা বর্ণের রেশমী বস্ত্রে সুশোভিতা পারশী রমণীগণকে দেখিলে মনে হয়, যেন ধরাতলে স্বর্গীয় অপ্সরাগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা ডিম্ব ও অন্যান্য বস্তুর ব্যবহার দ্বারা বর্ণের উজ্জ্বলতা সাধনের জন্য যথেষ্ট যত্ন করেন।

পারশীগণ ইংরাজী ধরণে বাস করে। গৃহের শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, সন্তানদিগের বিদ্যা ও ধর্ম্মাদি শিক্ষার প্রতি পারশী রমণীগণের যথেষ্ট মনোযোগ আছে। রমণীগণ শিক্ষিতা, অতিশয় সাহসী ও কার্য্যনিপুণা। স্বামীর বর্ত্তমানেও ইঁহারা সর্ব্ববিধ বিষয়কার্য্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা করেন। পারশী রমণীদিগের গার্হস্থ্য ব্যবস্থা, সন্তানাদির শিক্ষা ও কার্য্যনিপুণতা এ দেশের অন্যান্য রমণীদিগের অনুকরণীয়।

কিন্তু এই উন্নত জাতির ধর্ম্ম ও পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট কুসংস্কার আছে। ইহারা অগ্নির উপাসক। প্রতিদিন প্রাতে ইঁহারা ৫।১০ মিনিট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করতঃ মন্ত্রোচ্চারণ করে। এই মন্ত্র পারস্য ভাষায় লিখিত বলিয়া মনে হয়, কারণ ইহারা মন্ত্রের অর্থ জানে না। ইহারা নিজেদের মাতৃভাষা (পারস্যভাষা) সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন গুজরাটী ভাষাই ইহাদের মাতৃভাষার ন্যায়। তবে কেহ কেহ পারশী ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকে।

পারশীদিগের মধ্যে দুই একটী অদ্ভুত নিয়ম দেখা যায়। ইহারা নিয়মিতরূপে ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত গোমূত্র

ভক্ষণ করে। ইহারা মৃতদেহকে নিজহস্তে গৃধ্র ও শকুনির সম্মুখে ভক্ষণ করিতে দিয়া আসে। Tower of silence অর্থাৎ 'নিস্তব্ধ মন্দির' নামক একটী স্থান আছে, তথায় ইহারা মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। ইহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বালক বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেই, এমন কি কোন কোন পরিবারস্থ লোকে প্রত্যহই অল্প মাত্রায় মদ্যপান করিয়া থাকে। মদ্যপানকে ইহারা কিছুমাত্র লজ্জাজনক বা অন্যায় বলিয়া মনে করে না। ইহার ফলে অনেকে একেবারে মাতাল হইয়া দাঁড়ায়। পারশীদিগের পুত্র ও কন্যা উভয়েই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

ইতিহাস-খ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রগণ বম্বের আর এক প্রধান অধিবাসী। মহারাষ্ট্রগণের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। ইহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তবে আমাদের দেশের ন্যায় গোঁড়া হিন্দু নয়। ইহাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগের সম্মুখে অথবা রাজপথে অবলীলাক্রমে যাতায়াত করেন। জুতা পায় দেন। উপযুক্ত বর না পাইলে অধিক বয়সে নারীর বিবাহ হয়। কন্যা-দিগকে স্কুলে উচ্চ শিক্ষা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, তাহাতে হিন্দু আচারের কোনই ত্রুটী হয় না। মহারাষ্ট্রীয়গণ আমাদের দেশের হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার দেবদেবীর পূজা করে। সামাজিক অনেক বিষয়ে ইহারা এরূপ উন্নত, যে আমাদের দেশের হিন্দুসমাজস্থ লোকের তদ্রূপ উন্নতি হইতে এখনও বহু বৎসরের প্রয়োজন।

মহারাষ্ট্র মহিলাদিগের মধ্যে অনেকে অতি সুশিক্ষিত ও ইংলণ্ডপ্রত্যাগত। কিন্তু ইংলণ্ডপ্রত্যাগত রমণীও স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া জাতীয় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত জ্যাকেট ও নাকে নথ পরিধান করেন। ইহা দেখিলে বড় আশ্চর্য্য বোধ হয়।

মহারাষ্ট্র রমণীদিগের মধ্যে অনেকেরই বর্ণ অতি উজ্জ্বল। তবে সুশ্রী রমণী অল্প। এ অঞ্চলস্থ সধবা মহারাষ্ট্র রমণীগণ মাথায় কাপড় দেন না। বিধবা হইলে মাথায় কাপড় দিবার নিয়ম। সধবা ব্রাহ্মণ মহিলামাত্রেরই মস্তকে সুবাসিত নানারূপ কুল ও পত্র পরিধান করিবার নিয়ম। তবে আজ কাল অন্যান্য জাতীয় মহারাষ্ট্র মহিলারাও ফুল পরিধান করেন।

মহারাষ্ট্রদিগের মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ তাহারা নিরামিষ-ভোজী, তাহারা মৎস্যাদি ভক্ষণ করে না। মাথায় সিন্দুরের ফোঁটা, গলায় পুঁতির মালা, হাতে কাচের চুড়ী ও নাকে নথ, এই সকল সধবার লক্ষণ। ইঁহারা কাছা ও কোঁচা দিয়া কাপড় পরেন। ইঁহাদের গৃহে বিশেষ শৃঙ্খলা অথবা শাসনাদি নাই। ইঁহাদের রীতি নীতি অধিকাংশই আমাদের দেশের হিন্দু পরিবারের ন্যায়। মহারাষ্ট্র রমণীগণ সর্ব্বদা প্রচুর অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সম্ভ্রান্ত রমণীগণ বহির্গমনকালে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করেন। সূতার কাপড় পরেন না।

বম্বাইয়ে অনেক গুজরাটী বাস করেন। ইঁহারা ব্যবসায়-বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত। গুজরাটীদিগের মধ্যে অনেকে লক্ষপতি ও ক্রোড়পতি। কিন্তু ইঁহারা পারশী-দিগের অপেক্ষা ধনী নহে। তবে মহারাষ্ট্রদিগের অপেক্ষা ধনী বলিয়া বোধ হয়। অনেকে বলেন, ইঁহারা আতিথ্যের জন্য সুপরিচিত। গুজরাটীদিগের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে—ভাটিয়া ও বেনিয়া। ভাটিয়াগণ বেনিয়া অপেক্ষা ধনী। বেনিয়াগণ অত্যন্ত কৃপণ বলিয়া বিখ্যাত। ধনী ভাটিয়া রমণীগণ বিবাহাদিতে সর্ব্বাঙ্গ কেবলমাত্র মুক্তালঙ্কারে শোভিত করিয়া থাকেন। গুজরাটীদের মধ্যে গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ দুই দেখা যায়। তথাপি ইহাদের মধ্যে যেরূপ পরমাসুন্দরী নিখুঁত রমণী দেখা যায় সেরূপ অন্যান্য জাতির মধ্যে অল্পই আছে। গুজরাটীগণ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী। তবে মহারাষ্ট্রদিগের ধর্ম্মনিয়মের সহিত ইহাদের ধর্ম্মনিয়মের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে অনেক ব্রতাদি প্রচলিত। নব বিবাহিতা বালিকারা স্বামীর কল্যাণের জন্য একরূপ ব্রত গ্রহণ করে, সেরূপ আমাদের দেশে আছে কিনা জানি না। ইহারা প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া ইচ্ছামত ১২।২০।২৪ জন সধবার ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা পরাইয়া তবে আহার করেন।

গুজরাটীগণ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেয়। কন্যাকে অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষাদান করে। ইহাদের মধ্যে

উচ্চশিক্ষিত মহিলা দু চারিজন আছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অধিক নাই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা বোম্বের লোকের নীতিজ্ঞান অনেক উজ্জ্বল। উচ্চশ্রেণী ভিন্ন নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও ইহার যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতাই ইহার কারণ। স্বাধীনা রমণীগণ রমণী জাতিকে সম্মান ও ভয় করিতে জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন। ইহারা জানে, যে ইহারা যদি সামান্য চাকরাণীকেও একটী গালি দেয় তজ্জন্যও দণ্ডিত হইবে, সুতারাং তাহারা সম্ভ্রমে ও সংযতভাবে চলিতে শিখিয়াছে। সেন্সাস রিপোর্ট দেখিলেই জানা যায়, যে বম্বের নীতি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অনেক পরিশুদ্ধ।

যাঁহারা অতি অল্পদিনের জন্যও বোম্বাইয়ে বাস করিয়াছেন, তাঁহারাও বম্বের মহত্ব ও বিশেষত্ব অনুভব করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকই ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বম্বাইকে স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করিতে ইচ্ছা হয়। বম্বের সর্ব্বত্র—বাহিরে পথে ঘাটে পরিচ্ছন্নতা শৃঙ্খলা, সুনিয়ম ও শাসন, নারীজাতির সম্মান, নর নারীর মুক্ত স্বাধীনতা,—আর ভিতরে সকল বিভিন্ন জাতি ও বিচিত্র ভাষাবলম্বীর মধ্যেও আশ্চর্য্য একতা। ইহাই বম্বের সকল বিচিত্রতার মধ্যে অধিক বিচিত্র এবং সকল বিশেষত্বের মধ্যে বিশেষ বিশেষত্ব। বাস্তবিকই কোনও একটী বিশেষ কার্য্য সাধন করিবার কালে এখানকার বিভিন্ন জাতীয় লোক জাতি ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়। প্রাণপণ শক্তি দিয়া প্রচুর অর্থ ঢালিয়া সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ইহারা বৃহৎ ও মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছে।

স্ত্রীস্বাধীনতাতে বম্বের অঙ্গে পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে, সমুদ্রতীরে, পর্ব্বত-পাদদেশে, মাঠে ঘাটে যখন পারশী রমণী ও বালিকাগণ রেশমী বস্ত্রে শোভিতা হইয়া, মুক্ত বাতাসে খেলিয়া বেড়ায় তখন মনে হয় যেন স্বর্গের নন্দন হইতে গোলাপগুচ্ছ স্খলিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এখানে দেখিবার মত স্থান অনেক আছে। বম্বের মার্কেট, ভিক্টোরিয়া গার্ডেন, লাইট হাউস্, এলিফেন্‌টা-কেভ্, উরলী ও অন্য কয়েকটী হ্রদ, পারশীদিগের Tower of Silence এবং তদ্ভিন্ন হিন্দু, পারশী ও মুসলমানদিগের উপাসনালয়গুলিও দেখিবার উপযুক্ত। এখানকার বৌরী বন্দর ষ্টেশন, আন্‌জুমানী ইস্‌লাম নামক স্কুল, তাজ-মহল হোটেল, গবর্ণমেন্ট সেক্রেটেরীয়েট, উৎকৃষ্ট কলা বিদ্যার (Engineering skill) পরিচায়ক।

বম্বের নিকটস্থ ছোট ছোট পর্ব্বতগুলির জল হাওয়া অতি স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্যলাভের জন্য অনেকেই এই ছোট ছোট পর্ব্বতে (Hill Station) বাস করিতে গিয়া থাকেন। খান্‌ডালা, লোনাভেলি, মহাবালেশ্বর ও ম্যাথি-রানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরম রমণীয়। এ সকল স্থানের আব হাওয়া অতি স্বাস্থ্যকর, এবং প্লেগাদির কোনও তাড়না নাই। বম্বে হইতে অনেক বস্তু নানা স্থানে আমদানী রপ্তানী হয়। এখানে অনেক সুতা ও কাপড়ের কল আছে। আফিং, তেল, চিনি, কয়লা, মদ, গম, এবং ধাতু প্রভৃতি এখান হইতে রপ্তানী হয়।

শ্রীকুমুদিনী গাঙ্গি
বম্বে।

গোতমীগাথা।

(অপদান হইতে)

বৌদ্ধ ত্রিপিটকের দ্বিতীয় পিটকের নাম সুত্তপিটক, এবং এই সুত্তপিটকের প্রধান ভাগ, নিকায় গ্রন্থগুলি লইয়া। এই প্রধান নিকায়গুলির পরে যে ১৫খানি খুদ্দক নিকায় পাওয়া যায়, অপদান তাহার মধ্যে একখানি। থেরী গাথার পালি টীকায়, থেরীদিগের জীবন চরিত সম্পূর্ণ করিবার জন্য অপদান হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত আছে। অপদান পড়িয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে, যে উহাতে অনেক শ্রমণ শ্রমণীর স্বরচিত গাথা যথাযথ সুরক্ষিত রহিয়াছে। যে সময়ে অপদান লিখিত হয়, তখন বুদ্ধদেবের নামে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য অপদানকার, শ্রমণশ্রমণী-দিগের জীবনেরও পূর্ব্বজন্মের ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। যোজনার জন্য অন্য রচনা থাকিলেও, শ্রমণশ্রমণীদিগের নিজের রচনা বাছিয়া লওয়া দুঃসাধ্য নহে। বুদ্ধঘোষ



পার্শী গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী খুরসেদবাই ডক্টর।



কুমারী হীরাবাই পারেখ, বি, এ।

চেরি প্রেস : কলিকাতা।

যে সকল ঐতিহ্য এবং চরিত-কথা অবলম্বন করিয়া বহু পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপিটকের টীকা লিখিয়াছিলেন, সেই সকল ঐতিহ্য, ও চরিতকবিতা, সকল শ্রমণেরাই জানিতেন এবং কণ্ঠস্থ রাখিতেন।

অপদানে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা আছে, তাহা পাঠ করিবামাত্রই প্রতীতি হয়, যে সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকের রচনা। সুশিক্ষিতের রচনার মার্জ্জিত ভাষা এবং সালঙ্কার পদগুলির মধ্যে অল্পশিক্ষিতের সরল রচনা অনায়াসেই ধরা পড়ে। যে পুণ্যশীলা মহাপ্রজাপতী গোতমী, মা হইয়া বুদ্ধদেবকে মানুষ করিয়াছিলেন, তাঁহার নামেও অপদানে অনেক রচনা আছে। ঐ রচনার সরলতা, ভাবপ্রবণতা এবং নিরতিশয় অকপটতা হইতে সহজেই বিশ্বাস হয়, যে রচনাগুলি মহাপ্রজাপতী গোতমীর নিজের। ইঁহারই পরামর্শে ভগবান বুদ্ধদেব স্ত্রীজাতির অধিকার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইনিই রমণী ভিক্ষুণীদিগের শাসন এবং রক্ষায় নিযুক্তা ছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের যুগের স্ত্রীলোকের রচনা পাঠ করিতে কাহার না আগ্রহ হয়? তাহার উপর আবার এই মহিমাময়ী গোতমী দেবী নারীজাতির মুক্তির জন্য সর্ব্ব প্রথমে উদ্যোগিনী বলিয়া, ভারত-মহিলারা নিশ্চয়ই ইঁহার রচনা পাঠে ভক্তিসহকারে অগ্রসর হইবেন।

আমি আজি ভারত-মহিলাদিগের জন্য, অপদান হইতে মহাপ্রজাপতীর গাথার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। দুচারিটি কথার একটু টীকা দিব, এই পর্য্যন্ত; কেননা এই রচনা অতি সরল এবং সুখবোধ্য। প্রবন্ধটি লিখিবার উদ্দেশ্য এই, যে শিক্ষিতা মহিলাগণ, থেরীগাথা এবং অপদান পাঠ করিয়া, পুণ্যব্রতা রমণীদিগের রচনা এবং জীবনচরিতের সহিত সুপরিচিতা হউন।

গাথা।

অহং সুগত তে মাতা, ত্বংচ বীর পিতা মম।
সদ্ধম্ম সুখদ নাথ, তয়া জাতম্হি গোতম।

(তুমি আবার উত্তম ধর্ম্ম দান করিয়া আমাকে নবজন্ম দান করাইয়া পিতা হইয়াছ)

সংবড্ঢিতোয়ং সুগত, রূপকায়ো ময়া তব।
অনিন্দিতো ধম্মতনু মম সংবড্ঢিতো তয়া।

(আমি তোমাকে বাড়াইয়াছিলাম; তুমি আমাকে ধর্ম্মতনু দিয়াছ)

মুহুত্তম্ তণ্হা সমণম্ খীরং তং পায়িতো ময়া।
তয়াহং সন্তং অচ্চন্তং ধম্মখীরং পি পায়িতা।

(মুহূর্ত্তের জন্য যে তৃষ্ণা, তাহা প্রশমনের জন্য তোমাকে দুধ খাওয়াইয়াছিলাম; তুমি আমাকে যে ধর্ম্মদুগ্ধ পান করাইয়াছ, তাহাতে অক্ষয় শান্তি লাভ করিয়াছি)

মন্ধাতাদি নরিন্দানং যা মাতা সা ভবাণ্ণবে।
নিমুগ্গা হং তয়া পুত্ত, তারিবা ভবসাগরা।

(মান্ধাতাদি রাজাদের মাতার নাম ভবসাগরে লুপ্ত; তোমার মা হইয়া আমি ভবসাগরে উদ্ধার লাভ করিয়াছি)

রঞ্ঞো ঞমাতা মহেসীতি সুলভং নাম ইৎথিনং।
বুদ্ধমাতাতিযম্ নামং এবং পরম দুল্লভম্।

(রাজার মা, রাজার মহিষী, এ সকল নাম স্ত্রীলোকদের পক্ষে সুলভ;)

*　　*　　*　　*　　*

ইৎথিকাণঞ্চ পব্বজ্জাম্ যমহং যাচিতং পুনপ্পুনং
এৎথ চে অৎথি দোসোমে, তং খমস্সুরোসত।

(স্ত্রীলোকদিগের প্রব্রজ্যায় অধিকার দিবার জন্য আমি পুনঃপুনঃ তোমাকে বলিয়াছিলাম; সে জন্য যদি কিছু দোষ হইয়া থাকে তাহা ক্ষমা করিও। "যমহং" পদে ছন্দ পতন হইয়া গিয়াছে।)

ময়াভিক্‌খুনীয়ো বীর, তবাণুঞ্ঞায় সাসিতা।
তত্র চে অৎথি দুন্নীতং খমস্সু তং খমাপিতা।

(তোমার আজ্ঞায় আমি ভিক্ষুণীদিগকে শাসন করিয়াছি। সেই কার্য্যে যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহার জন্যও, হে (খমাপিতা) ক্ষমার আধার, আমাকে ক্ষমা করিও)

*　　*　　*　　*　　*

ন তিত্তিং পুব্বম্ তব দস্সনেন
চক্খুং ন সোতং তব ভাসিতেন।
চিত্তং মম কেবলমেকমেব
পপ্পুয্য তং ধম্মরসেন তিত্তিম্।

{ (তুমি যখন ছেলেটি ছিলে) তখন তোমাকে দেখিয়া, তোমার কথা শুনিয়া, চক্ষু শ্রোত্রের তেমন তৃপ্তি হয় নাই; যেমন তৃপ্তি তোমার দত্ত ধর্ম্মরস পান করিয়া পাইলাম। }

থেরীগাথার হউক অথবা অপদানের হউক, কোন প্রকার অনুবাদ নাই বলিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ না হয়েন। দোকানদারী হইবে ভাবিয়া একটু সঙ্কুচিত হইতেছি। যদি পাঠিকাদিগের আগ্রহ হয়, আমি যথাসাধ্য সমগ্র থেরীগাথা এবং অপদানের অনেক অংশ অনুবাদ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যদি কোন শিক্ষিতা মহিলা থেরীগাথাদির পদ্যানুবাদ করিতে অগ্রসর হয়েন, তবে ভাল হয়। প্রাচীন কালের ভারত-মহিলার মুক্তি এবং অধিকারের ইতিহাস, সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ভক্তি ও সেবা।

কলিকাতার ক্যামাক ষ্ট্রীটে একটি সেবাশ্রম আছে। কয়েকটি ইউরোপীয় মহিলা ঐ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যে সকল পুরুষ ও রমণী চিররুগ্ন, যাহাদের কেহই নাই, তাহারাই এই আশ্রমে বাস করে,—ইউরোপীয় রমণীগণ তাহাদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আশ্রমে লইয়া আসিয়াছেন।

পনর বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই পুণ্যাশ্রম দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া তরুতলায় বাস করিত, তাহারা এখন ধনীর প্রাসাদ তুল্য রমণীয় অট্টালিকায় দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র-শয্যায় শয়ন করিয়া আছে এবং স্নেহ ও করুণা ইউরোপীয় মহিলার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রসন্নমুখে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেছে।

এই আশ্রম দেখিবার পূর্ব্বে একবার একটী নির্ঝরিণী দেখিয়াছিলাম। নির্ঝরিণীর ধারে দাঁড়াইয়া ভাবিয়াছিলাম,—এই নির্ঝরিণী এমন সুরম্য শৈল-অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কাহার্ কোন্ আকর্ষণে দুর দুরান্তরের নদী সকলকে পূর্ণসলিলা ও মৃত্তিকাকে শস্যশ্যামলা করিবার জন্য প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে? আজ আবার এই সেবাপরায়ণা মহিলাদিগকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইঁহারা ইউরোপের উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাহার্ কোন্ আকর্ষণে সুদূর বাঙ্গালাদেশে আসিয়া নরনারীর সেবা করিতেছেন?

পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর পাই নাই। এবার মনে মনে যে প্রশ্ন করিলাম, কিছুক্ষণ পরেই তাহার উত্তর পাইলাম। সেবিকাগণ যখন রোগীদের দেখাইয়া আমাদিগকে উপাসনাগৃহে লইয়া গেলেন এবং উপাসনার সময় তাঁহাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন ভক্তির দিব্য রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন বুঝিলাম, ইঁহারা শুধুই সেবিকা নহেন,—ইঁহারা ভক্তিমতী নারী। তার পর শুনিলাম, তাঁহাদের কোন অর্থসম্বল নাই, একমাত্র ঈশ্বরপ্রীতিই সম্বল। তাঁহারা ঈশ্বরের আহ্বানেই এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, যখন যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; তাই প্রার্থনাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র। প্রার্থনায় ইঁহাদের এমন বিশ্বাস যে, ইঁহারা মনে করেন, প্রার্থনা সরল ও অকৃত্রিম হইলে তাহা দ্বারা তাঁহাদের সকল অভাবই পূর্ণ হইবে। বাস্তবিক তাহাই হইতেছে।

সুতরাং বুঝিতে পারিলাম, ঈশ্বরের আহ্বানেই ইঁহারা ঘরের বাহির হইয়াছেন, ঈশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিয়াই ইঁহারা চিরকুমারী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের প্রেমের আকর্ষণেই ইঁহারা এই সুদূর বাঙ্গালা-দেশে আসিয়া দুঃখীর সেবা করিতেছেন।

এই যে বহুদিন পূর্ব্বে সংসারে স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা ছবির মত আজিও আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া আছে। আমরা বিস্তর লোকের নিকট এই দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছি; আমাদের পরিচিত অনেক পুরুষ ও রমণী এই সেবাশ্রম দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন, ভক্তি ও সেবায় নারীর মূর্ত্তি যে কি সুন্দর হইতে পারে, তাঁহা এই ইউরোপীয় মহিলাদিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বাস্তবিক ভক্তি ও সেবায়ই নারীর সৌন্দর্য্য। বর্ষাকালের হরিদ্বর্ণ লতা যেমন পুষ্প ও কিশলয়ে সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি নারীর সুকুমার হৃদয় ভক্তি ও সেবায়ই সুন্দর হইয়া উঠে। হিন্দু নারীর হৃদয় যে এত সুন্দর, তাহার কারণই ভক্তি ও সেবা। তাঁহারা বাল্যকালে পিতামাতাকে ভক্তি করেন; ছোট ছোট ভাই বোন্‌দের পরিচর্য্যা করেন, একটু বড় হইয়াই স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করিতে এবং তাঁহাদের সেবা করিতে আরম্ভ করেন। ভক্তি ও সেবায়ই তাঁহাদের জীবন কাটিয়া যায়।

কিন্তু হায়, হিন্দু নারীর এই ভক্তি ও সেবা ক্ষুদ্র পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই থাকিয়া যায়; তাহা আর ইউরোপীয় সেবাপরায়ণা নারীদিগের ভক্তি ও সেবার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের ভক্তি ও সেবা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। উদ্যানের একটি বৃহৎ গোলাপ পুষ্পের সঙ্গে যেমন ক্ষুদ্র বনফুলের তুলনাই হয় না. তেমনি এই দুই শ্রেণীর রমণীদিগের দুই রকম ভক্তি ও সেবার মধ্যে তুলনাই হইতে পারে না। পিতামাতা স্বামী ও শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রাণের টানে, কর্ত্তব্যের খাতিরে এবং শাসনের ভয়ে সকলেই ভক্তি করিতে বাধ্য হন ও তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বানে ঈশ্বরচরণে জীবন যৌবন সমর্পণ করা এবং তাঁহারই প্রেমের আকর্ষণে দীনদুঃখীর সেবা করা,—বড়ই সৌভাগ্যের কথা। ইহাতেই দুর্ল্লভ নারীজন্ম সার্থক হয়।

এরকম উচ্চ অঙ্গের ভক্তি ও সেবার অধিকারিণী হইতে হইলেই সুশিক্ষার আবশ্যক। ঈশ্বরকৃপায় ক্রমশঃই এ দেশের রমণীদিগের শিক্ষার প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে. অনেক রমণীই স্কুল কলেজে পড়িতেছেন। যাঁহাদের স্কুল কলেজে পড়িবার সুবিধা হয় না. তাঁহারাও গৃহে রাশি রাশি বাঙ্গালা গ্রন্থ ও সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র পড়িয়া শিক্ষালাভ করিতেছেন। এ সময় আমরা এ দেশের রমণীদিগকেও উচ্চ অঙ্গের ভক্তি ও সেবার অধিকারিণী বলিয়া মনে করিতে চাহি।

এখানে সেবা কথাটি আর একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতে চাই। সেবার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি বলিয়া যে, শুধু রোগীর সেবাকেই সেবা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। রোগীর পরিচর্য্যা, দরিদ্রের দুঃখমোচন, স্বদেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নানা প্রকার কার্য্য, তাহাকেও সেবা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভক্তি শব্দটিতে কেবল মাত্র ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে হইবে।

অতএব এই জাতীয় উত্থানের দিনে নিশ্চয়ই শিক্ষিতা নারীদিগের নিকট উক্তরূপ ভক্তি ও সেবার প্রত্যাশা করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

অনেকে বলেন, উক্তরূপ ভক্তি ও সেবা এদেশের নারীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক নয়—এদেশের নারীদিগের উহা আদর্শই নয়। তাঁহারা ইহার প্রমাণ স্বরূপ এদেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের উল্লেখ করেন। বলেন—সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় আদর্শই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এদেশের সাহিত্যে স্ত্রীলোকদিগের কোন্ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে? উপনিষদে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পাঠ করা যায় বটে, কিন্তু আমাদের পরমোৎকৃষ্ট কাব্য দুখানির মধ্যে নারী-জীবনের কোন্ আদর্শ অঙ্কিত হইয়াছে?

সকলেই জানেন, রামায়ণ ও মহাভারতে সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি পুণ্যশীলা নারীদিগের চিত্রই অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সেই সকল অতুলনীয় চিত্রের অনুপম শোভা দেখিয়াই হিন্দুললনা মুগ্ধ হইয়াছেন এবং ভক্তি-বিস্মিতচিত্তে তাঁহাদের চরিত্রের অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল চিত্র পতিভক্তির উজ্জ্বল কনকবর্ণেই রঞ্জিত; পতিভক্তিতে সেই সকল সাধ্বীসতীগণ এমন উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন, পতির জন্য এমন আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা মানবী হইয়াও জগৎপূজ্যা দেবীরূপে গণ্যা হইয়াছেন, এবং কত যুগযুগান্তর ধরিয়া অসংখ্য নরনারীর ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিতেছেন।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এদেশে নারীর ভক্তির আদর্শ স্বামীভক্তি, সেবার আদর্শ স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা। এদেশের স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই দেবতা, স্বামী ভিন্ন রমণী

আর আরাধনা করিবে কাহার? রমণীর সেবার সীমাও স্বামীর গৃহের মধ্যে; তাঁহার পক্ষে গৃহের বাহিরে যাওয়াই নিষিদ্ধ।

যাঁহারা এই সকল কথা বলেন, তাঁহারা ইহার প্রমাণ স্বরূপ আধুনিক সাহিত্যেরও উল্লেখ করেন। উচ্চ অঙ্গের বাঙ্গালা উপন্যাসে, কাব্যে ও নাটকে শুধুই ত রমণীদিগের পতিভক্তির কথা পাঠ করা যায়। রমণীগণ শুধুই যেন বিবাহ করিতে এবং স্বামীকে ভালবাসিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীকে ভালবাসাই যে নারীর নারীত্ব, তাহা জানি—সে রকম চিত্র ত চাইই; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তি ও সেবাপরায়ণা নারীর চিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথায়? সত্য বটে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্ল ও শ্রীকে ভক্তিমতী এবং সেবাপরায়ণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি প্রাচীন আদর্শের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই বলিতে হইবে, ইউরোপীয় সেবাপরায়ণা নারীদিগের ভক্তি ও সেবার অনুরূপ ভক্তি ও সেবা এদেশের নারীদিগের আদর্শ নয় এবং তাহা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবও হইবে না।

এই সকল কথার মধ্যে যে সত্য নাই তাহা নহে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। বৌদ্ধ-সাহিত্যে এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে নারীদিগের সেবা ও ভক্তির বিবরণ পাঠ করা যায়। সম্রাট অশোকের জীবনচরিতে অনেকেই পড়িয়াছেন যে, তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষু-ব্রত অবলম্বন করিয়া সিংহলে গমন করেন। মহেন্দ্রের ধর্ম্মোপদেশে আকৃষ্ট হইয়া সিংহলের রাজা তিষ্য ও রাণী অনুলা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাণী অনুলা ও তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রচারিকার প্রয়োজন হইয়া উঠে। সেই জন্য অশোকের পরমা গুণবতী ও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পাঁচ জন রমণীকে সঙ্গে লইয়া সিংহলে গমন করেন এবং ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন।

এই ত গেল বৌদ্ধ-সাহিত্যের কথা। বৈষ্ণবদিগের ভক্তমাল গ্রন্থ হয় ত অনেকেই পড়িয়াছেন। পরিপক্ক আঙ্গুর ফলটি যেমন মিষ্ট রসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তেমনি ভক্তমাল গ্রন্থ ভক্তির মিষ্ট রসে পূর্ণ হইয়া আছে। কেবল দুঃখ এই যে, এই ভক্তির মিষ্ট রসের সঙ্গে স্থানে স্থানে অশ্লীল কথার একটু তিক্ত রসও আছে। কিন্তু তাহা থাকিলেও এই গ্রন্থের মধ্যে এমন সকল ভক্তিমতী নারীর চরিত্র বর্ণিত আছে যে, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। উপন্যাসের নায়ক যেমন নায়িকার অন্তরে প্রেমের এক মায়াকুহক বিস্তার করিয়া তাহার মনকে আকুল করে, তেমনি জগতের স্বামী স্বয়ং যেন এই সকল নারীর হৃদয়ে প্রেমের মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা রূপের গর্ব্ব, ভোগের অভিলাষ ও পতি-পুত্রের মায়া ত্যাগ করিয়া জগৎপতির চরণে জীবন-যৌবন সমর্পণ করিয়াছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিতেছি। জয়পুরের রাজা মাধব সিংহের স্ত্রী অতিশয় রূপবতী; স্বামীর তিনি প্রিয়তমা মহিষী; রূপৈশ্বর্য্যে সর্ব্বদাই তিনি গর্ব্বিতা। এক দিন তিনি রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া স্বর্ণ-পালঙ্কে শয়ন করিলেন এবং এক জন পরিচারিকাকে তাঁহার চরণপদ্ম সেবা করিতে আদেশ করিলেন। পরিচারিকা কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা। তাই সে যখন রাণীর সুন্দর পা দুখানিতে হাত বুলাইতে লাগিল তখন তাহার অন্তরের কৃষ্ণভক্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল। পরিচারিকা মনে ভাবিল, আজি যেন সে তাঁহার প্রিয়তম দেবতা শ্যামসুন্দরের চরণসেবা করিতেছে। তাই তাহার নয়ন ভক্তিনীরে পরিপ্লুত ও হৃদয় প্রেমে আর্দ্র হইল; সে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

রাজমহিষী পরিচারিকার অন্তরে কৃষ্ণভক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি রূপের গর্ব্ব, সম্পদের অভিমান ত্যাগ করিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন—"বল বল, মধুর কণ্ঠে আবার ঐ নাম বল; আমার মোহমুগ্ধ কঠিন প্রাণ ঐ নামে আর্দ্র হইয়া যাক্।"

রাণী পুনর্ব্বার কহিলেন—"আর না, আর আমার চরণ স্পর্শ করিও না; দাও তোমার ঐ পা দুখানিই আমার গর্ব্বিত মস্তকের উপর উঠাইয়া দাও।"

দেখিতে দেখিতে রাণীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল;

তিনি তাঁহার রত্নালঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান করিলেন; ভোগৈশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার স্বামী যুদ্ধের জন্য কাবুলে গমন করিয়াছিলেন। মন্ত্রীর উপরই রাজ্যভার অর্পিত ছিল। মন্ত্রী রাণীর পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিরক্ত হইলেন। রাণীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "মহারাণি, আপনার পক্ষে কি বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করা ও বৈষ্ণবদিগের সেবা করা শোভা পায়?"

রাণী লিখিলেন—"মন্ত্রি, তুমি আর কাহাকে রাণী বল? আমি যে এখন আমার জীবন-দেবতার দাসী হইয়াছি,—

"রাণী কহে রাণী আর না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখি দিনু যুগলকিশোরে॥
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে।
চতুর্ব্বর্ণ তেয়াগিনু কৃষ্ণ-প্রেম-কাজে।"*

অতঃপর রাজা রাণীর কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন; রাণীকে কঠোর শাস্তি দিলেন; রাণীকে নানা পরীক্ষার মধ্যে ফেলিলেন। কিন্তু স্বর্ণখণ্ড যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি শাস্তি এবং পরীক্ষার মধ্যে রাণীর অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অবশেষে রাজা এই ভক্তিজ্যোতিঃ-বিমণ্ডিতা মহিমাময়ী রাণীর বিচিত্র ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন; এমনই বিস্মিত হইলেন, যে রাণী যে তাঁহার পত্নী সে কথা ভুলিয়া গেলেন; রাণীর চরণতলে নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে নারীদিগের ভক্তি সম্বন্ধে ইহার চেয়ে আর কি উৎকৃষ্ট চিত্রের প্রত্যাশা করিতে পারি? একজন তেজস্বী নৃপতি আপনার স্ত্রীর অনুপম ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া তাঁহার পদতলে মস্তক অবনত করিতেছেন,—কি অপূর্ব্ব দৃশ্য!

কিন্তু যদি বৌদ্ধ-সাহিত্যে কিম্বা বৈষ্ণব-সাহিত্যে নারীজীবনের এই উচ্চতম আদর্শ অঙ্কিত না-ই থাকিত, তাহা হইলেই বা কি? বর্ত্তমান সময় রমণীদিগের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আদর্শেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইবে। পুরুষেরা শিক্ষালাভ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, আহার, নিদ্রা, পরিণয় এবং পরিবার প্রতিপালন প্রত্যেকের পক্ষেই কর্ত্তব্য, প্রত্যেকের পক্ষেই ইহা স্বাভাবিক; এ কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হওয়ায় অপরাধ আছে; এ কর্ত্তব্য উত্তমরূপেই প্রতিপালন আবশ্যক; অথচ ইহা দ্বারা মানুষের উচ্চতর জীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। উন্নত জ্ঞান, নির্ম্মলা ভক্তি এবং পরসেবাতেই মানুষের মহত্ত্ব। এই মহত্ত্ব যে যতটা লাভ করিতে পারে, তাহারই জীবন সেই পরিমাণে ধন্য।

রমণীগণও শিক্ষা পাইলে বুঝিতে পারিবেন, পরিণয়, পতিসেবা, সন্তানপালন ও গৃহকর্ম্ম প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক, প্রত্যেকের পক্ষেই কর্ত্তব্য; কোন গূঢ় কারণ ব্যতীত এ কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইলে অপরাধ হইবে। অথচ এই কর্ত্তব্য পালনই নারীজীবনের চরম-উদ্দেশ্য নহে। ইহার চেয়েও নারীজীবনের উচ্চতর, মহত্তর কর্ত্তব্য আছে। যে নারী উন্নত জ্ঞান, নির্ম্মলা ভক্তি ও নরসেবার অধিকারিণী হইবেন, যে নারী চিত্তকে জ্ঞানে উজ্জ্বল, ভক্তিতে সুন্দর ও সেবায় সুপবিত্র করিয়া তুলিতে পারিবেন, তাঁহারই নারীজন্ম চরিতার্থ হইবে। নচেৎ শরীরের শক্তি, অন্তরের ভক্তি ও হস্তের সেবাকে শুধুই আপনার ক্ষুদ্র গৃহখানির মধ্যে স্বামী ও সন্তানের দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলে সুখ মিলিবে বটে, কিন্তু মহত্ত্ব মিলিবে না; গৃহধর্ম্ম রক্ষা হইবে বটে, কিন্তু নিষ্কাম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম রক্ষা হইবে না।

ইহা শুধুই আমাদের কল্পনা নহে। যাঁহারা শিক্ষিতা রমণীদিগের খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন, এখন আর তাঁহারা শুধু গৃহকর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রটুকুর মধ্যেই আপনাদিগকে অবরুদ্ধ করিতে চাহেন না; তাঁহারা গৃহের বাহিরে বিশ্বের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে বিপুল জনসঙ্ঘের সহিত মিলিত হইয়া সমাজের ও দেশের জন্য কিছু করিয়া নারীজন্মকে ধন্য করিতে চাহেন। তাহা চাহেন বলিয়াই ত তাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য মহিলা-সমিতি স্থাপিত করিতেছেন, দুর্ভিক্ষের জন্য চাঁদা তুলিতেছেন, সাহিত্যের

* ভক্তমাল গ্রন্থে "মাধব সিংহের রাণী"র আখ্যায়িকা দেখুন।

সেবা করিয়া দেশের উন্নতি করিতেছেন। শিক্ষিতা রমণীদিগের চিত্ত যে সমাজের সেবার জন্য, দেশের কাজের জন্য কিরূপ আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা "আলো ও ছায়া" রচয়িত্রীর কাব্য পাঠ করিলেই বুঝা যায়। "আলো ও ছায়া"র উচ্চশিক্ষিতা উপাধিধারিণী গ্রন্থকর্ত্রী বলিতেছেন,—

"মহৎ উদ্দেশ্যে যবে
এক সাথে মিলে সবে
পারি না মিলিতে সেই দলে,
পাছে লোকে কিছু বলে।
বিধাতা দেছেন প্রাণ
থাকি সদা ম্রিয়মাণ,
শক্তি মরে ভীতির কবলে
পাছে লোকে কিছু বলে।"

ইহার পরই গ্রন্থকর্ত্রী প্রার্থনা করিতেছেন,—

"ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জ্জন।"

ভগবান রমণীদিগের এই উচ্চাভিলাষ যদি পূর্ণ করেন, যদি তাঁহারা "ভীতির শৃঙ্খল" ছিন্ন করিয়া একেবারে "জগতের পায়ে" আপনাদিগকে "বিসর্জ্জন" করিতে পারেন, তাহা হইলেই নারীর উচ্চশিক্ষা সার্থক হইবে এবং আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ ধন্য হইবে।

দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে একথা বুঝিতে পারেন নাই, তাহা নহে। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র একথা বুঝিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি আনন্দ-মঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম এই পরমোৎকৃষ্ট উপন্যাস তিনখানির মধ্যে শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী ও জয়ন্তীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন,—

"পতিপূজাই স্ত্রীর একমাত্র পূজা—পতিসেবাই স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম্ম—এই কথা সাধারণ রমণীকে সহজেই বুঝাইতে পারা যায়। কিন্তু রমণীর শিক্ষা যখন উচ্চতর হইবে—যখন এই পতির পতিকে তাহারা সাক্ষাৎ ভাবে দেখিতে চাহিবে তখন তাহাদের কি হইবে—তাহাই প্রদর্শন করিতে এই সকল স্ত্রীচরিত্রের অবতারণা। সাধারণ শিক্ষিতা রমণীগণ সীতা, সাবিত্রী, সূর্য্যমুখী, কমলমণিকে সহজেই আদর্শ মনে করিতে পারে, কিন্তু জয়ন্তীর ন্যায় শিক্ষিতা, শ্রীর ন্যায় শিক্ষিতা রমণী অত সহজে তাহা পারে না। তাহাদের চিত্তে উচ্চ শিক্ষার জন্য যে একটা ভাব উপস্থিত হয়, সেই ভাবের বিচিত্র লীলা এই সকল উপন্যাসে বিবৃত হইয়াছে। * * জ্ঞানবতী রমণীর নিকটে এক দিকে পতি, অন্য দিকে সেই পতিরও পতি; এক দিকে সুখ ও সংসার, অন্য দিকে সুখদুঃখবিরহিত সংসার বা সন্ন্যাস স্থাপন করিয়া কবি কি অপূর্ব্ব দৃশ্যই প্রদর্শন করিয়াছেন।" লেখক অন্যত্র বলিতেছেন,—"শান্তি, প্রফুল্ল, শ্রী ও জয়ন্তী—ইহাদের শিক্ষা অতি উচ্চ অঙ্গের। * * ঘরকন্না ও দাম্পত্য প্রেমও এশিক্ষার লক্ষ্য নহে। এশিক্ষার লক্ষ্য অতি উচ্চ—এ শিক্ষার লক্ষ্য অতি মহান্। * * সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণই যে শিক্ষাকে চরম শিক্ষা বলিয়া থাকেন, এই সকল স্ত্রীচরিত্র সেই শিক্ষাতেই সুশিক্ষিতা। যে নির্ম্মল নিষ্কাম ধর্ম্ম ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন— * * যে শিক্ষার লক্ষ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা দুঃখনিবৃত্তি, চিত্তশুদ্ধি, প্রফুল্ল, নিশি, শ্রী ও জয়ন্তীতে আমরা সেই শিক্ষারই পরিচয় পাইয়াছি। তোমার সূর্য্যমুখীই বল, ভ্রমরই বল, এই সকল স্ত্রীচরিত্রের তুলনায় তাহারা অতি সামান্যা রমণী।"*

এই উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের অঙ্কিত চিত্রগুলির দ্বারা আমাদের প্রবন্ধেরই মূল মত সমর্থিত হইয়াছে। চিন্তাশীল কবি রবীন্দ্রনাথের "মালিনী"-শীর্ষক অতি উৎকৃষ্ট একখানি নাট্য কাব্য আছে। ঐ কাব্যখানির মধ্যেও তিনি রমণীর ধর্ম্ম ও সেবার আদর্শ পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মালিনী রাজকন্যা; কিন্তু সম্রাট অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়ই জগতের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। মালিনী কহিলেন,—

* "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থে 'সীতারামের' সমালোচনা দেখুন।

"ব্যথাসম
কি যেন বাজিছে আজি অন্তরেতে মম
বারম্বার—কিছু আমি নারি বুঝিবারে
জগতে কাহারা আজি ডাকিছে আমারে।"

ইহার পর মালিনী বিশ্বকার্য্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন এবং আপন হৃদয়ের মাহাত্ম্য আপনি অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়!
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা—
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ যেথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে!"

আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা সুশিক্ষিত, যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী, যাঁহারা উদার এবং চিন্তাশীল, তাঁহারা সকলেই ইচ্ছা করেন এবং আশা করেন যে, শিক্ষিতা নারীদিগের শক্তি গৃহের নিম্ন সোপানেই কেবল রুদ্ধ হইয়া থাকিবে না; তাহার উর্দ্ধে যে ঈশ্বর ভক্তি, স্বদেশের কার্য্য ও নরসেবা রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিবে। সেই জন্যই তাঁহারা সাহিত্য, কার্য্য ও সংবাদ পত্রের ভিতর দিয়া তাঁহাদের ইচ্ছা ও আশা প্রকাশ করিতেছেন।

তদ্ভিন্ন এই জাতীয় উত্থানের দিনে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারিতেছেন যে, রমণীদিগের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন। রমণীদিগের অন্তরে ঈশ্বরভক্তি ও সেবার ভাব বর্দ্ধিত এবং বিকশিত না হইলে, তাঁহারা পুরুষদিগের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সঙ্গিনী হইতে পারিবেন না; তাঁহারা ধর্ম্মের ও কর্ম্মের সঙ্গিনী না হইলে আমাদের দেশও উন্নত হইবে না। আমাদের দেশের কোটি কোটি শিশুর শিক্ষার ভার তাঁহাদেরই হস্তে। শিশুগণ যদি জননীর নিকট কেবল টুকটুকে বউ বিবাহ করিয়া আনা ও টাকা রোজগার করিয়া বউকে সোণার গহনায় সাজানই পরম পুরুষার্থ বলিয়া না শেখে,—তাহারা যদি জননীকে ঈশ্বরভক্তির জন্য আকুল এবং নরনারীর সেবার জন্য ব্যাকুল দেখিতে পায়,—তাহারা যদি জননীর নিকট ভক্তি এবং সেবার মহৎ শিক্ষায়ই সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলেই দেশ জাগিবে, দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে।

সুতরাং শিক্ষিতা রমণীদিগের ভক্তি এবং সেবার অধিকার লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা আবশ্যক। অনেকে হয় ত ভাবিবেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বদেশের সেবার জন্যই শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যাকুল হওয়া প্রয়োজন, ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিবার আবার দরকার কি?

ইহার উত্তর এই যে, বৃক্ষের ফুল ও ফলের মত ভক্তি ও সেবার ভাব নারীহৃদয়ে এক সঙ্গেই বাস করে। ভক্তির ফুল ফুটিলেই সেবার ফল ফলিতে আরম্ভ করে। আমরা আগেই ইউরোপীয় মহিলাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বুঝাইয়াছি যে, সুগভীর ঈশ্বরভক্তির শক্তিতেই তাঁহারা সেবার গুরুভার বহন করিতে পারিতেছেন। রমণীগণ যদি ঈশ্বর-প্রেমে উন্মাদিনী হইতে না পারেন, সেবার জন্য অন্তরে যদি ঈশ্বরের হৃদয়ার্দ্রকারী আহ্বান ধ্বনিই শুনিতে না পান, তবে কি শুধুই শুষ্ক কর্ত্তব্যজ্ঞানের দ্বারা সেবার সঙ্কটময় কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিতে পারিবেন? শুধু রমণীগণ কেন? যে সকল শক্তিগর্ব্বিত পুরুষ কেবলই আপনার পায়ের জোরে এ পথে চলিতে চাহেন, তাঁহাদেরও এ কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, চলিতে চলিতে যখন রক্তাক্ত চরণে অবসন্ন হইয়া পড়িবেন, তখন কে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিবে? কে অবসন্ন দেহে শক্তি সঞ্চার করিবে? তখন কি পুরুষ, কি নারী, প্রত্যেকের অন্তরেই যদি অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি থাকে, সেই ভক্তির আলোকে যদি ঈশ্বরকে জীবনের প্রভুরূপে দেখিতে পান এবং ঈশ্বর যদি তাঁহাদের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলেন,—"ওগো পুত্র, ওগো কন্যা, চাহিয়া দেখ, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। ভয় কি? সম্মুখে অগ্রসর হও, আমিই তোমাদিগকে শক্তি দান করিব।" তাহা হইলেই তাঁহারা বিক্ষত চরণের রক্তের দাগ মুছিয়া সম্মুখে চলিতে পারিবেন এবং অভীষ্ট কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন; নচেৎ তাঁহারা আপন আপন কল্পনাবলে সেবার এক একটা বিরাট আদর্শ সৃজন করিবেন ও সেই আদর্শ

কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন বটে; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

সেই জন্যই পুরুষ ও নারীর পক্ষে ভক্তি ও সেবা এই দুয়েরই আবশ্যক। জানি না কবে বর্ষাকালের বারি-পরিপূর্ণা তটিনীর ন্যায় বঙ্গরমণীর হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইবে, কবে সেই ভক্তিপরিপূর্ণ নারীহৃদয় বিশ্বের উন্মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া যাইবে।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

পল্লী-মাতা।

দাঁড়াইয়া চরণের পাশে।
জানি আমি অপরাধী, তবু যে সন্তান তোর,
ডাকিবে না সুমধুর ভাষে?
দেখিলে কাঁদে যে প্রাণ শীর্ণ তব পাণ্ডু মুখ,
ম্লান আঁখি, যেন পুত্রহীনা।
অঙ্গে তব ছিন্ন বাস, পৃষ্ঠে রুক্ষ কেশপাশ,
কাঙ্গালিনী, অনাথিনী, দীনা।

সে সুখের দিন আজি গত;—
তোমার স্নেহের কোলে বালক বালিকা দল
দিবানিশি খেলিত গো কত;
যৌবনের প্রেম হাসি ছড়াইত দিকে দিকে,
যুবকেরা গাহিত যে গান;
বধূদের রাঙা পায় নূপুর বাজিয়া যেত,
হর্ষে তব পূর্ণ হ'ত প্রাণ;
আজ ফুরায়েছে সব, থেমেছে আনন্দ রব,
কে কোথায় কোন্ দেশে দেশে;
অর্থ তরে সহিতেছে নত শিরে পদাঘাত,
মৃত্যু-স্রোতে কেহ গেছে ভেসে।

রাজেশ্বরী ছিলে একদিন।
তোমারি এ গৃহ মাঝে কত না উঠিত গীত,
কত সুরে বাজিত মা বীণ।
তোমারি প্রাঙ্গন তলে ফুটিয়া রহিত ফুল
নানা বর্ণে দিক আলো করি'।
কিশোরীরা আলবালে যতনে ঢালিত বারি,
পাখীকুল যেত প্রাণ ভরি'।
কোথাও নাচিত শিখী কোথাও গাহিত পিক,
"বউ কথা কও" বলে কেহ,
শুনি' সে পাখীর গান বধূরা মরিত লাজে,
কল হাস্যে পূর্ণ হ'ত গেহ।
কি আনন্দ কি যে সুখ স্মরিলে বিদরে বুক,
নেত্র হ'তে ঝরে বারিধারা।
হায় মা মোদের সম কেবা আছে দীন দুঃখী,
তোরে ছেড়ে মোরা ভাগ্য-হারা!

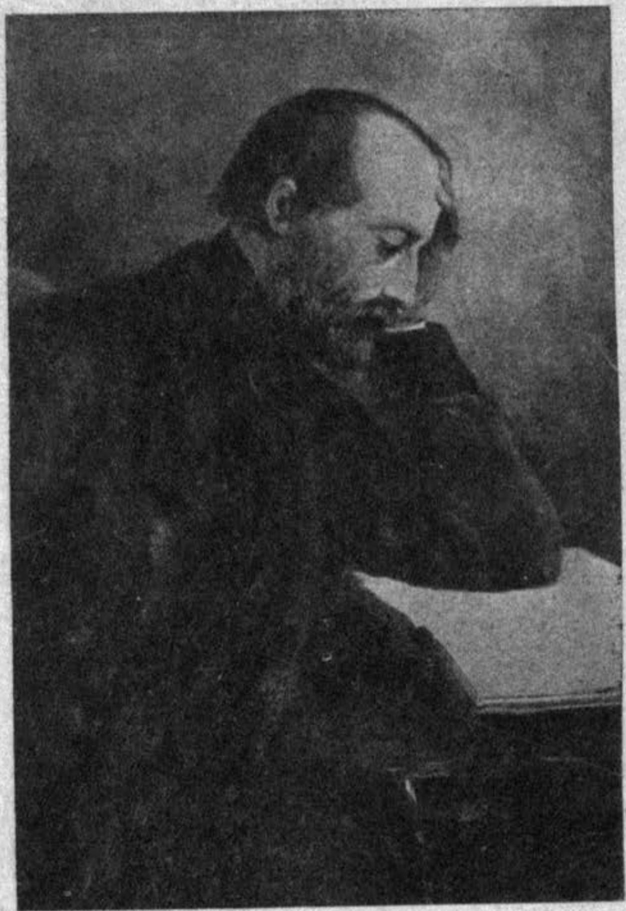
আজ দেখি, ফুটেছে নয়ন।
বিদেশীর ভালবাসা, দাসত্বের যত মান
জননি গো, বুঝেছি এখন।
জানি না কি মোহ ঘোরে ভুলিয়াছিলাম তোরে,
তোর এই শান্তিপূর্ণ বাট।
গিয়াছিনু অর্থ তরে পাদুকা মাথায় ল'য়ে
ছেড়ে তোর শস্যভরা মাঠ।
আজ মা এসেছি ফিরে, স্নেহে কোলে লও তুলে
ভুলে যা'গো সকল বেদনা।
শান্তিমাখা পূত কর অঙ্গে বুলাইয়া দাও,
শিরে কর আশিষ চুম্বন।

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তি-উচ্ছ্বাস।

ওরে! খুলে দেরে দ্বার, আন্ সাজি ভরি,—
শেফালি-করবী-জবা; পরম ঈশ্বরী
আসিছেন গৃহে মোর; আজ হৃদি খুলি,
রাতুল চরণযুগে দিব পুষ্পাঞ্জলি,
ভুলে গিয়ে শোকদুঃখ—আলেয়ার খেলা,—
নির্জ্জনে, নিরালা গৃহে বসিয়া একেলা।
কত দিন গৃহে মোর জলে নাই দীপ!
অন্ধকারে, রুদ্ধ গৃহে নিভায়ে প্রদীপ,—

৮০ (A)



ম্যাট্‌সিনি।

৮০ (A)

বসেছিনু হাসুপ্রায়; আজ আর নহে।
আজি জেলে দে'রে দীপ প্রতি গৃহে গৃহে;
ঘুচে যাক্ অন্ধকার; ভক্তির আলোকে,
মুক্ত দ্বারে, মাতৃমূর্ত্তি নেহারি পুলকে।
আজ আর নহে দুঃখ, অশান্তি নিরাশা,
হাহাকার-ভরা অশ্রুধারা প্রাণ-নাশা;
আজি শুধু হাসি—আর কুসুম চন্দন
বিল্বদল সহ, পদে আনন্দে অর্পণ।

শ্রীমৃণ্ময়ী দেবী।

ম্যাট্‌সিনি।

(৩)

"Ideas ripen quickly when nourished by the blood of myrters."

পিডমণ্ট (Piedmont) প্রদেশের নবীন রাজা চার্লস্ যতদিন যুবরাজ ছিলেন, কারবোনারী সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে যোগদান করিতেন, এবং ইটালীর জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক জন সমবিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেন। এই কারণে ইটালীর লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধার-মন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মাদিগের অনেকেরই মনে তাঁহার সম্বন্ধে একটা বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, এই যুবরাজ চার্লস্ যখন রাজা হইবেন, রাজশক্তি যখন ইঁহার হস্তগত হইবে, তখন সেই শক্তির দ্বারা চার্লস্ নিশ্চয়ই আমাদিগের সাহায্য করিবেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে আমাদের নেতা হইয়া দাঁড়াইবেন, এবং তখন ইটালীর উদ্ধারসাধন আর এরূপ দুষ্কর হইবে না। ম্যাট্‌সিনির মনেও তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ একটা আশা ছিল। তিনি ইটালী পরিত্যাগের অতি অল্পকাল পরেই, চার্লস্‌কে এক খানি পত্র লেখেন। চার্লস্ তখন রাজা হইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্বভাব অনেক পরিমাণে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ক্রমশঃ অপর রাজাদিগের পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ইটালীর স্বাধীনতার চিন্তা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া গেল। এমন অবস্থায় আশা ও নিরাশামিশ্রিত ভাব লইয়া মহাব্রত ম্যাট্‌সিনি তাঁহাকে লিখিলেন:—"এইবার সময় হইয়াছে, আপনি ইটালীর জাতীয় স্বাধীনতালাভ-সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।" ফরাসী ও অষ্ট্রীয়ার ভয়ে ভীত, নৈতিক সাহসে দীন চার্লস্ কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। ম্যাট্‌সিনি তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু পিডমণ্টের সৈন্যদিগের উপর আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদিগের উপর অত্যধিক ভরসা রাখিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন মাত্র সৈনিক কর্ম্মচারী তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত ছিলেন।

ম্যাট্‌সিনি বিদেশে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার বন্ধুগণ ইটালীতে থাকিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রাজপুরুষগণ সমস্ত ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পলায়ন করিল, কিন্তু অনেককেই কারারুদ্ধ হইতে হইল। দ্বাদশ জন যুবককে গুলি করিয়া হত্যা করা হইল। ম্যাট্‌সিনির প্রিয়তম বন্ধু জ্যাকোপো রাফিনিকে (Jacopo Ruffiini) অশেষ যন্ত্রনা দিয়া ষড়যন্ত্রের সংবাদ জানিবার চেষ্টা করা হইতে লাগিল। জ্যাকোপো উপায়ান্তর না দেখিয়া, গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেশের ও বন্ধুদিগের অকল্যাণ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয় জ্ঞান করতঃ কারাগারে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

ম্যাট্‌সিনি যখন এই সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এক বৎসর যাবৎ তিনি নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যে মার্‌সেলিজে গোপনে বাস করিতেছিলেন—কেবল এই আশায়, যে এবারকার যুদ্ধে তাঁহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রেস ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাঁহাকে ফরাসীরাজ্য পরিত্যাগ করিবার হুকুম দেন। ম্যাট্‌সিনি কেবল ইটালীর পানে তাকাইয়া গোপনে বাস করিতেছিলেন। যুদ্ধের আয়োজন ব্যর্থ হইয়াছে শুনিয়া তিনি দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন;

এবং বন্ধুদিগের উপর নিদারুণ অত্যাচার হইতেছে জানিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু যখন জ্যাকোপোর আত্মহত্যার সংবাদ আসিল, তখন একবারে ক্ষিপ্তের মত হইয়া পড়িলেন; জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। এই পরীক্ষার সময়, কোনও মহিলার প্রেম তাঁহাকে তুলিয়া ধরিয়াছিল। ইঁহার বিষয় পরে বিবৃত হইবে।

এই ঘটনার পর ম্যাট্‌সিনি জেনেভা গমন করিলেন, এবং স্বদল পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আবার চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতা লাভস্পৃহা এবং তজ্জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রতিজ্ঞা জাগিয়া উঠিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ম্যাটসিনি আবার যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। নানা প্রদেশের অধিবাসীগণ ম্যাট্‌সিনির প্রস্তাব অনুসারে এক সময়ে সমর ঘোষণা করিতে প্রস্তুত হইল। রামোরিনো নামক এক জন সৈনিক পুরুষের উপর সেনানায়কের ভার অর্পণ করা হইল। এই হইল সকল অমঙ্গলের মূল। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সেনানায়ক কি জানি কেন যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন না।

ম্যাট্‌সিনি সৈন্যদিগের সহিত রামোরিনোর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৈন্যদল লইয়া উপস্থিত হইলে, নানা স্থানের সহায়গণ আসিয়া যোগদান করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল। সেনা-পতির কারণবিহীন অনুপস্থিতিতে ম্যাটসিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সাত দিন সাত রাত্রি তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া রাখিলেন। অবশেষে রামোরিনো আসি-লেন। ম্যাট্‌সিনি স্বয়ং সেনানায়কের কাজ করিতে পারিতেন; রামোরিনোর প্রতি তাঁহার বিশ্বাসও টলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি রামোরিনোর হস্তে সমস্ত কাজ বুঝাইয়া দিয়া "রাইফল" কাঁধে করিয়া সামান্য সৈনিকদের সহিত চলিতে লাগিলেন। অনাহারে অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায়, তাঁহার শরীর এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, যে পথ চলা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইল; তবুও মনের উৎসাহে পার্শ্বস্থ সৈন্যদের সাহায্যে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এত পরিশ্রম, বিশ্বাসঘাতক রামো-রিনোর চাতুরীতে পণ্ড হইয়া গেল। রামোরিনো সৈন্য-দিগকে বিপথে লইয়া গেল, এবং হঠাৎ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হওয়ার আদেশ করিয়া চলিয়া গেল। একটা মহা গোলোযোগ আরম্ভ হইল। এই সময় ম্যাট্‌সিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন, তখন দুশ্চিন্তায়, নিরাশায় ও অসহনীয় যাতনায় উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কত সময় তিনি মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেন এবং আপনি আপনার শরীর দংশন করিতেন। মহৎ ও বিশ্বাসী হৃদয়ে নিরাশার তীব্রতা অত্যন্ত ভয়ানক। এই সঙ্কটকালেও সেই মহিলার প্রেমপূর্ণ পত্রাবলী ম্যাট্‌-সিনিকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সুইজারল্যাণ্ড অপরাপর ইটালীবাসীদিগের সহিত ম্যাটসিনিকেও রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। অনেকেই বাধ্য হইয়া সুইজারল্যাণ্ড ত্যাগ করিলেন। ম্যাটসিনি ভাবিলেন, ইটালীর কাছে থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অতএব গুপ্ত ভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তিন বৎসরকাল অনবরত পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া সুইজারল্যাণ্ডের নানা স্থানে ফিরিতে লাগিলেন। জ্যাকোপোর দুই ভাই ব্যতীত অপরাপর বন্ধুগণ সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তিনি পুস্তক, গাইটার যন্ত্র এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব ভাল বাসিতেন। কিন্তু বন্দী ম্যাটসিনির ভাগ্যে এগুলিও দুর্লভ হইল। অসুস্থতায়, অর্থাভাবে, আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়জনদের বিরহবেদনায় ম্যাটসিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

বার বার যুদ্ধের আয়োজন পণ্ড হইয়া যাওয়ায় "ইয়ং ইটালীর" সভ্যগণ স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে নিতান্ত নিরাশ ও অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা সকলেই সমস্ত দোষের বোঝা ম্যাটসিনির স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ম্যাটসিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাব-সুলভ মিষ্ট প্রকৃতি হারাইলেন, মানুষ দেখিলে বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজকে অপরাধী বলিয়া

মনে হইতে লাগিল। তাঁহার জীবন যন্ত্রণাময় হইয়া পড়িল।

এই সময় তিনি তাঁহার কোনও বালিকা-বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন;—"সেদিন আমি দূরবর্ত্তী আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের পানে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, ঐ আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের পরপারে আমার প্রিয় জন্মভূমি ইটালী—দুর্দ্দশামগ্ন ইটালী; সেখানে আমার মাতাপিতা এবং ভগ্নিগণ, প্রাণের বন্ধুগণ এবং দেশের ও স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতজীবন মহাত্মাগণ রহিয়াছেন, সেখানকার প্রকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং সুনীল আকাশ কত সুন্দর! এ সকলের মধ্যে মৃত্যুও সুখকর; এই সব চিন্তা আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করিতেছিল।"

নিজের অকৃতকার্য্যতা, শারীরিক অসুস্থতা এবং আর্থিক অভাব তাঁহার মানসিক যাতনার একমাত্র কারণ নহে। এই সকল কারণেও তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইতেন বটে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুশ্চিন্তার কারণ ছিল—তাঁহার প্রিয় বন্ধুদিগের দুর্দ্দশা। যাঁহারা তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন এবং যাঁহাদিগকে তিনি প্রীতির আকর্ষণে নিজের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার জন্য গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন পলাতক অথবা বন্দী—এই চিন্তা তাঁহাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিত। যে মহিলাকে তিনি তাঁহার হৃদয় দিয়াছিলেন দুর্ভাগ্যের তাড়নায় তাঁহাকে গৃহ দিতে পারেন নাই, কারণ ম্যাট্‌সিনির প্রেমের জন্য তাঁহাকে পুলিসের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি তাঁহার মাতাকে লিখিয়াছিলেন—"আমি যদি তোমাদিগকে এবং আমার আর কয়েক জন প্রিয় বন্ধুকে পাই, তবে হাসিমুখে মরিতে পারি।" জীবনধারণ করা তাঁহার নিকট কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এক জন বন্ধুকে সে সময়ে তাঁহার মনের ভাব জানাইয়াছিলেন:—"আমি ভাল করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু আমার দ্বারা সকলের ক্ষতিই হইয়াছে, এই চিন্তা আমাকে পাগল করিতেছে। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমি যাহাদিগকে ভালবাসি তাহারা আমাকে ঘৃণা করে।" কি ভয়ানক মানসিক দুর্যোগ!

এই প্রকার যখন তাঁহার মানসিক অবস্থা তখন তিনি আপনাকে নিতান্ত একাকী ও অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন গভীর সন্দেহে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এ সবই কি বৃথা চেষ্টা? শান্তিময় প্রেমপূর্ণ গৃহ হইতে এতগুলি আত্মাকে পথের বাহির করিয়াছি, সংগ্রামক্ষেত্রে ভীষণ মৃত্যুর মুখে ফেলিয়াছি; এত পরিশ্রম, এত রক্তপাত, এত হাহাকার ও এত প্রাণ-বলিদান, একি কেবল মাত্র আমার শূন্যগর্ভ অহঙ্কারের বিষময় ফল? এইরূপ চিন্তায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত, এবং তন্দ্রাবেশে প্রায়ই শুনিতে পাইতেন, তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু জ্যাকোপো পরলোক হইতে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। কত সময় আত্ম-হত্যা করিয়া আপনার রক্ত দ্বারা কল্পিত কলঙ্করাশি ধৌত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এ জীবন কেবল অপরের অমঙ্গলের জন্য, এ জীবনের দ্বারা জগতের কোনও মঙ্গল হইবে না, এইরূপ সন্দেহ ও নিরাশার অন্ধকারে যখন ম্যাটসিনির জীবন নিমজ্জিত হইতেছিল, তখন ম্যাটসিনিকে কে রক্ষা করিয়াছিল, কে তাঁহার প্রাণের প্রদীপ আবার উজ্জ্বল করিয়া জ্বালিয়া দিয়াছিল, কে তাঁহার হাত ধরিয়া মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়াছিল? নারীর প্রেম এবং তাঁহার সুদৃঢ় নৈতিক বল। মহা-পুরুষদিগের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহাদের যেমন অসীম শ্রদ্ধা, তেমনি অপর পক্ষে তাঁহাদের জীবনের উপর নারীর প্রেমের স্বর্গীয় প্রভাব। তাঁহারা জগতের দুঃখ-কষ্ট, পাপ-তাপ, অত্যাচার-অবিচার দেখিয়া, সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এবং সে সকলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং কত সময় নিরাশায় চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছেন; অপরের জীবন যাহাতে সার্থক ও সুন্দর হয় তাহার প্রয়াস দূরে থাকুক, নিজের জীবনও ধ্বংশ করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন, এইরূপ বিপদের সময় একমাত্র রমণীর প্রেম তাঁহাদিগকে নব শক্তি, নব আলোক এবং নব আশা দান করিয়াছে। নারী-প্রেমসুধার এই সঞ্জীবনী শক্তি মহাপুরুষদিগের জীবনে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রেম এবং সুদৃঢ় সতেজ কর্ত্তব্যজ্ঞান

ম্যাটসিনিকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ করিল।

কি বিশ্বাসের আলোকে, কি নিরাশার অন্ধকারে, কোনও অবস্থাতেই ম্যাটসিনি কর্ত্তব্য পালনে বিরত ছিলেন না। তাঁহার মাতা, পিতা ও বন্ধুগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবার জন্য বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাহা অসম্ভব; আমরা ভগবৎ-প্রেরণায় সমস্ত দেশবাসীর দুঃখের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইয়াছি, আমরা ঈশ্বর ও জনসাধারণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছি, তিনিও আমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু যে দেশে কাজ করা দূরে থাকুক, কথা বলার এবং লেখারও স্বাধীনতা নাই, সে দেশে তিনি কি প্রকারে রাজনীতির ক্ষেত্রে কাজ করিবেন? তিনি স্থির করিলেন, যেখানেই থাকি না কেন, জীবনের দ্বারা জীবনের আহারনিদ্রা, বেশভূষা, কার্য্য, ত্যাগস্বীকার ও উন্নত নিয়মানুগামিতায় ইটালীবাসীদিগকে একটী উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইব; দেখাইব, জীবন নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য, দেখাইতে হইবে, জীবনের আদর্শকে কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয়, এবং সকল বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সবল করিয়া তুলিতে হয়; দেখাইব, কর্ত্তব্যের পথে, মহত্ত্বের পথে কেহ সঙ্গী না থাকিলেও কেমন করিয়া একাকী নির্ভয়ে পথ চলিতে হয়।

এই প্রকার মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পর ম্যাটসিনি গত ৫০ বৎসরের ঘটনাবলীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন, এবং উপর্য্যুপরি পরাজিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর এই মীমাংসায় উপনীত হইলেন,—ফরাসী-বিপ্লব হইতে জনসাধারণ কেবল সুখ ও স্বার্থের উদ্দেশ্যেই কাজ করিতেছে, কোনও উন্নততর লক্ষ্য সম্মুখে বর্ত্তমান নাই। ফরাসী-বিপ্লবের কাজ শেষ হইয়াছে, এখন উন্নততর আদর্শ সম্মুখে ধরিতে না পারিলে নবশক্তি লাভ অসম্ভব। এতদিন কেবল স্বার্থ, সুখ, সত্ব, অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যাপারেই মানুষের মন আবদ্ধ ছিল। এখন ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন হইয়াছে। আধ্যাত্মিকতা, দায়িত্বজ্ঞান ও পরার্থপরতা ব্যতীত নবযুগে নবশক্তির সম্ভাবনা নাই, জয়ের আশা নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

তৃষ্ণাতুর।

সুধার পিপাসী আত্মা সদা জেগে রয়,
ঊর্দ্ধ পানে মুক্ত করি সমগ্র হৃদয়
প্রফুল্ল নলিনী সম; যদি কেনো দিন
সুধা-স্থলী চন্দ্রলোক অর্গল-বিহীন
হয়ে যায় অকস্মাৎ দয়ালু রাজার
মঙ্গল ইঙ্গিত লভি'! মুক্ত সুধা-ধার
যদি সেই মুক্ত-পথে ধীরে আসে নেমে
শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করি অফুরন্ত প্রেমে!
কত জন্ম কেটে গেল হেন মহা ধ্যানে,
আরো কত জন্ম বৃথা কাটিবে কে জানে?
নির্ম্মম রহস্য পূর্ণ জন্ম জন্মান্তরে
অতৃপ্ত আত্মার তৃষা অন্তর-অন্তরে
দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে!—কোথা হে মধুর,
কখন করিবে শান্ত চির-তৃষ্ণাতুর?

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আমরা গৃহাভিমুখে ফিরিলাম। সারা পথ আমরা আর কোন কথা কহিতে পারি নাই। যখন রকৃভিল হোটেলের নিকট আসিলাম, দেখিলাম, দ্বারের সম্মুখে ল্যাণ্ডলেডি। তিনি মিঃ রায়কে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাহার পর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, 'ইনি কে?' আমি লজ্জায় মরমে মরিয়া গেলাম; কোন কথা গোপন রহিল না। তিনি হাসিয়া পরিচয় দিলে, ল্যাণ্ডলেডিও হাসিলেন এবং

শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ওঃ, সেই জন্যই সেদিন বৃষ্টির সময় আসিয়াও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তখনি আমার মনে হইয়াছিল, আপনাদের ভালবাসার বন্ধন আছে।"

তিনি হাসিয়া দু একটি কথা বলিয়া চলিয়া আসিলেন; তাহার পর আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আমি কি তোমার ঐ ভালবাসার যোগ্য হইতে পারিব?" আমি আর সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "আমি এইবার একা যাইব, একত্রে যাইতে পারিব না।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা চল, আমিও আসিতেছি।"

আমি দ্রুতপদে পুলকিত হৃদয়ে মিসেস্ চৌধুরীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। দ্বারে আয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমায় দেখিবা মাত্র বলিল, "মেম্‌সাহেব আপকো বহুত দেরসে সেলাম দিয়া হ্যাঁয়, গোল কামরামে সব জন হ্যাঁয়।"

আমি কুণ্ঠিত হইয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, মিসেস্ চৌধুরী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বসিয়া আছেন। মিস্ চৌধুরীরা দুই পাশে দুই জন বসিয়া আছেন। আমি গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্র মিসেস্ চৌধুরী বলিলেন, "মিস বসু, আপনার এ কি প্রকার ব্যবহার?"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "কোন ব্যবহারের কথা বলিতেছেন?" তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, "কোন্ ব্যবহার? সেই বারটার সময় বাহির হইয়াছেন, আর বেলা চারিটার সময় গৃহে আসিলেন? দার্জ্জিলিংএ আপনার পরিচিত কেহ নাই বলিয়াছিলেন, এতক্ষণ তবে কোথায় কাহার সহিত ছিলেন? ভদ্র ঘরের মেয়েদের সহিত থাকিতে হইলে ভদ্র ব্যবহার চাই।"

আমি নিরুত্তরে রহিলাম, ভাবিলাম, দেখি কতদূর যায়। তিনি পুনরায় কহিলেন, "ভদ্র ঘরের মেয়ে বলিয়া, আমি মিঃ দত্তের কথায় আপনাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তখন জানি নাই, যে আপনার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, নোটিশ পর্য্যন্ত দিয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেছে। নিশ্চয়ই তাহা আপনার দোষেই গিয়াছে।"

আমি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "আমার দোষে নয়, আমার ইচ্ছায় গিয়াছে এ কথা বলিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আপনাদের কি ক্ষতি হইয়াছে? আমার কোন্ ব্যবহার আপনারা অভদ্রের মত দেখিলেন?"

তিনি বলিলেন, "ক্ষতি অনেক হইয়াছে। এখন মিঃ রায় আমাদের বন্ধু, তিনি সিভিলিয়ান, রূপে, গুণে, পদে শ্রেষ্ঠ। যাহাতে তাঁহার উপর আধিপত্য লাভ হয় তাহারই চেষ্টা হইতেছে। আমরা অন্ধ নহি, কাল লীলা বলিতেছিল, মিঃ রায়ের ছবি লইয়া দেখিতেছিলেন। কোথাকার অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে আনিয়া উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, দুধ ভাত দিয়া কালসাপ পুষিবার মত হইয়াছে। যে উপকারী, যাহার নিকট উপকৃত, তাহাকেই দংশন করিবার চেষ্টা! আপনি কি মনে করেন, আপনার ঐ সুন্দর মুখ দেখিয়া কোনও ভদ্রবংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি আপনাকে বিবাহ করিবে?"

আমার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আমি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। পুনরায় তিনি বলিলেন, "ওসব চালাকি আমি বুঝি না, আমাদের বাটীতে এসব হইবে না। আমি কাল মেলেই মিঃ দত্তকে লিখিব, আপনাকে আমাদের আর দরকার নাই।" সহসা কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। আমি বুঝিলাম কে; ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিলাম! তিনি আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইলেন; তাহার পর বলিলেন, "মিসেস্ চৌধুরী, আপনার দু চারিটি কথা আমি শুনিলাম, আপনি বহুদিন হইতে আমাদিগকে জানেন, এখন এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে আমার ভাবী পত্নী বলিয়া একটু সমাদরের চক্ষে দেখিতে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে?" তাহার পর আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "মণিকা, তুমি কাঁদিও না, উঁহারা না জানিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিছু মনে করিও না।"

আমার চক্ষের জল শুকায় নাই, আমি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না। মিসেস্ চৌধুরী নির্ব্বাক, মিস্ চৌধুরীরা নির্ব্বাক! তিনি মিসেস্ চৌধুরীর নিকট অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মিসেস্ চৌধুরী, এই দেখুন মিঃ দত্তের চিঠি, ইহাতে বুঝিবেন, তিনি আমাকে আপনার নিকট হইতে মণিকাকে গ্রহণ করিবার অনুমতি